জিহাদ আল আকবার : নফসের সাথে যুদ্ধ

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল মুসাভি আল খোমেইনী

অধ্যায় – ০ : বাংলা অনুবাদকের মুখবন্ধ

"জিহাদ আল আকবার : নফসের সাথে যুদ্ধ" বইটি ইমাম খোমেইনীর (র.) কিছু নির্বাচিত লেকচারের সংগ্রহ। ইমাম খোমেইনীকে (র.) অধিকাংশ মানুষ চেনে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মহান নায়ক হিসেবে। কিন্তু এর উর্ধ্বে তাঁর যে পরিচয় তাঁকে আল্লাহর কাছে সম্মানিত করেছে এবং আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহী ব্যক্তিদের বিস্মিত করেছে, তা হলো : ইমাম খোমেইনী (র.) ছিলেন একজন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সাধক। মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কতখানি গভীর ছিলো, তা পরিপূর্ণ অনুধাবন করতেও বোধকরি উচ্চ তাক্বওয়ার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তবে ইমাম খোমেইনীর (র.) সম্পর্কে জানেন, এমন ব্যক্তি জিহাদ আল আকবার বইটি পড়লে তাঁকে ভিন্ন আলোকে চিনতে পারবেন, এবং অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তিনি কেবলমাত্র একটি ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা-ই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন খোদার একজন প্রকৃত আ'রেফ। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তিদের স্পিরিচুয়াল জার্নি শুরু হতে পারে এই বইটি দিয়ে। ২০১৩ সালের একদম শেষের দিকে ঘটনাক্রমে বইটি পড়ার সৌভাগ্য হয় আমার। পঞ্চাশ পেইজের এই ছোট্ট পিডিএফ বইটি আমার কাছে এতটাই বৈপ্লবিক ছিলো যে, তা অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। পড়াশুনা, পরীক্ষা ইত্যাদিসহ নানান কারণে অল্প ক'দিনের একটি কাজে প্রায় পাঁচ মাস লেগে গেলো। তবে এমন সময়েই অনুবাদের কাজটা শেষের দিকে চলে এলো, যখন শাবান মাস উপস্থিত হয়েছে। আর একমাস পরই রমজান মাস শুরু। শাবান মাসের বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে অনেকেই জানেন। শাবান মাসের প্রস্তুতিতে এই বইটি আরো কিছু যোগ করবে বলে আশা করি।

বইটি আমার কিছুতেই অনুবাদ করা হতো না, কিন্তু ক'জন বন্ধুর উৎসাহ ও আগ্রহের কারণে অনুবাদে হাত দিতে হলো। তাঁদেরকে আল্লাহ অফুরন্ত প্রতিদান দিন, কারণ তাঁদের উৎসাহ ও তাগাদা ছাড়া বইটি অনুবাদ করা হতো না, আর আজকে তা আরো মানুষের হাতে তুলে দিতে পারতাম না। এই গোটা অনুবাদের পুরো কৃতিত্ব-ই তাই সেই দুয়েকজন ব্যক্তির।
বইটির যে বিষয়বস্তু, এ ধরণের বিষয় অনুবাদ করায় আমি অভ্যস্ত নই। বড় ধরণের ভুল-ত্রুটি ছাড়া হয়তো আর সংশোধন করার সুযোগ হবে না। যারা ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাদেরকে দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করবো সরাসরি ইন্টারনেট থেকে Jihad al-Akbar, The Greatest Jihad : Combat with the Self বইটি ডাউনলোড করে পড়ার জন্য। বাকিদের জন্য আমার অনুবাদটি রইলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অনুবাদের ভুল-ত্রুটি ছাপিয়ে সেই মেসেজটি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে যাবে, যেটা ইমাম খোমেইনী (র.) তাঁর জীবন ও কর্ম দ্বারা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

নূরে আলম।
মে ৩১, ২০১৪।

অধ্যায় – ১ : প্রকাশকের মুখবন্ধ

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব সাধারণত একমাত্রিক। কিন্তু মহৎ ব্যক্তিগণ, যারা সত্যিকার অর্থে মুক্তি লাভ করেছেন, যেমন আল্লাহর নবী এবং ওলীগণ – তাঁদের ব্যক্তিত্ব বহুমাত্রিক হয়ে থাকে। এই মহৎ ব্যক্তিগণের মাঝে কীভাবে একইসাথে বিভিন্ন মাত্রার ব্যক্তিত্বের সমন্বয় ঘটা সম্ভব, তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তায় বুঝে ওঠা প্রায়শঃ কঠিন। একজন অসামান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইমাম খোমেইনীকে সে ধরণের ব্যক্তিত্বদের মাঝে গণ্য করা যায়। নেতৃত্বের গুণাবলি, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির পাশাপাশি তাঁকে ইসলামী নীতিশাস্ত্রের এক অসাধারণ শিক্ষক হিসেবেও উল্লেখ করা যেতে পারে। নানান কারণে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দিকটি খুব একটা সুপরিচিত হয়ে ওঠেনি। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের আগে ইরাকের নাজাফ-এ নির্বাসিত অবস্থায় "নৈতিকতার" উপর দেয়া তাঁর কিছু লেকচার নিয়ে আপনাদের সামনে এই বইটি উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি সকলকে, বিশেষত ধর্মশাস্ত্রের ছাত্রদেরকে আত্মিক পরিশুদ্ধি, আত্মসংযম ও ধার্মিকতার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন।
যেহেতু ইংরেজিভাষী মুসলমানেরা তাঁর এই কর্ম নিয়ে পড়াশুনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সেহেতু "ইসলামিক থট ফাউন্ডেশান" এটা প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছে; এবং Dr. Muhammad Legenhausen এটি অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। ইতিপূর্বে ইমাম খোমেনীর আরেকটি গ্রন্থ, A Jug of Love-ও এই ফাউন্ডেশান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামিক থট ফাউন্ডেশান একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনভাবে অর্থায়ন ও পরিচালনা করা হয়।
সেমতো উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বদের ষাটটিরও বেশি লেখা প্রকাশ করা হয়েছে এ পর্যন্ত। আমরা দোয়া করি যেনো এই লেখার বিষয়বস্তু থেকে প্রিয় পাঠকেরা সর্বোচ্চ উপকৃত হন।

নিম্নের লেখাটি *"জিহাদ আল আকবার : ইয়া মোবারেযেহ ব নাফস"* শিরোনামে প্রকাশিত বইয়ের অনুবাদ। ইমাম খোমেইনী নাজাফে অবস্থানকালে (১৯৬৪-১৯৭৮) বিভিন্ন উপলক্ষে শিয়া মক্তবে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন তার সংকলন হলো এই বইটি। (মূল বইটি) সাইয়্যিদ হামিদ রুহানী কর্তৃক নির্বাচিত ও অনুলিখিত এবং উল্লিখিত শিরোনামে প্রকাশিত। প্রকাশ করা হয়েছে "ইনস্টিটিউট ফর দ্য কম্পাইলেশান অ্যান্ড পাবলিকেশান অব দ্য ওয়ার্কস অব ইমাম খোমেইনী" থেকে। প্রথম প্রকাশ : খোরদাদ ১৩৭২ (মে-জুন ১৯৭৩)। মুদ্রিত কপি : ১০,০০০। মুদ্রণ : লিন্ট্রন কম্পানি এনতেশারাত ইলমি ভা ফারহাঙ্গি। মূল্য : ৪০ তুমান।
এই অনুবাদটি বাক্বির আল-উলুম ইনস্টিটিউট, কোম এর ডিরেক্টোরেট অব রিসার্চ এর দায়িত্বে ইমাম খোমেইনীর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী (জুন ৪, ১৯৯৪) স্মরণে প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যায় – ২ : অনুবাদকের মুখবন্ধ

নিউ ইয়র্ক সিটির ওয়েস্ট ব্রডওয়েতে তুর্কি সুফিদের এক বইয়ের দোকান আছে। ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মকালে সেখান থেকে কিছু বই কিনেছিলাম আমি। সেখানেরই একজন কাস্টমার – গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ছোট সাদা টুপি – আমার সাথে কথা বলা শুরু করলো। সালাম বিনিময়ের পর যখন বললাম যে আমি ইরানে কাজ করতাম, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো আমি ইমাম খোমেইনীর "জিহাদ আল আকবার" নামক বইটা কখনো দেখেছি কিনা। তাকে বললাম যে যদিও আমি বইটি দেখিনি, আমার ধারণা হামিদ আলগার এটি অনুবাদ করেছেন তার অনুদিত ইমামের বক্তৃতাসমগ্রে (Islam and Revolution, by Mizan Press)। সে ঐ বইটি পড়েনি, কিন্তু জোর দিয়ে বললো যে আমেরিকান মুসলিমদের মাঝে ইমামের লেখার খুব চাহিদা আছে, আর বিশেষভাবে জিহাদ আল আকবার বইটার ব্যাপারে তার আগ্রহ বেশি। বাসায় যাবার পর দেখলাম নাজাফে দেয়া ইমামের যেসব বক্তৃতা নিয়ে জিহাদ আল আকবার প্রকাশ করা হয়েছে, তার কিছু প্রফেসর আলগার অনুবাদ করেছেন।
এরপর শরৎকালে যখন ইরানে ফিরলাম, দেখলাম যে ছোট পুস্তিকা আকারে "জিহাদ আল আকবার" পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। সুফি বইয়ের দোকানের সেই মুসলিমের কথা খেয়াল করে আমি পুরো বইটা অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ফার্সি ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকায় বুনিয়াদ বাক্বির আল-উলুম, কোম এ আমার সহপাঠী ও সহ-অনুবাদকারী আযিম সারভদালির শরণাপন্ন হলাম। তিনি প্রজেক্টটি পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং বুনিয়াদের উৎসাহে পরবর্তী জুনে কাজটি সমাপ্ত হলো : আলহামদুলিল্লাহ !

এই বইটি নৈতিকতার উপরে লেখা, ফার্সি এবং আরবীতে যাবে বলে আখলাক্ব। এটা কোনো দার্শনিক কাজ নয়, বরং নাজাফের মাদ্রাসার (হাওজা-এ-ইলম) ছাত্রদেরকে নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার এক প্রচেষ্টা। এই বইয়ে ইমাম খোমেইনীর নৈতিক সংবেদনশীলতা ফুটে উঠেছে, প্রকাশ পেয়েছে মাদ্রাসার প্রতি নিষ্ঠা ও পিতৃসুলভ শঙ্কা। এতে পাঠক ইমামের বৈপ্লবিক চেতনা ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি ঘৃণার পাশাপাশি আবিষ্কার করবে স্রষ্টার ধ্যানে ধ্যানমগ্ন এক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা। ইমাম খোমেইনীর চিন্তাধারার গভীরে ইরফানী (আধ্যাত্মবাদ) প্রবাহ বিদ্যমান, যা তাঁর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তুলেছে। "ইরফান এবং নৈতিকতা – উভয়েই চরিত্রের উন্নতি সাধন নিয়ে কাজ করে, কিন্তু ভিন্ন পারস্পেক্টিভ থেকে" – শহীদ মুতাহহারির এই মন্তব্যের প্রমাণ হলো এই বইটি। নৈতিক শিক্ষায় থাকে দোষ-গুণের বর্ণনা, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি; অপরদিকে ইরফানি শিক্ষায় থাকে এমনসব পদ্ধতির বর্ণনা, যার মাধ্যমে মানুষের আত্মা আল্লাহর দিকে এগিয়ে যায় এবং সেই যাত্রায় স্বর্গীয় গুণাবলি অর্জন করে। নৈতিক পরিবর্তন সাধনের যে পথের কথা ইমাম খোমেইনী বলেছেন তা হলো আত্মিক উন্নয়নের এমন এক পথ, যাতে পারদর্শী ব্যক্তি দুনিয়াবি চাওয়া-পাওয়াকে জয় করে, অতঃপর এতে (দুনিয়াবি বিষয়ে) নিস্পৃহ হয়ে গিয়ে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হয়ে যায়। এই পথকে আল্লাহর দিকে যাত্রা হিসেবে অভিহিত করা হয়, ইরফানে যা কেন্দ্রীয় আসন দখল করে আছে, এবং যাকে ইসলামের মূল-ও বলা যেতে পারে। সুফিদের কবিতায় এই যাত্রাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে; বর্ণনা করা হয়েছে মোল্লা সদরা-এর অসাধারণ দর্শনে, এবং ইমাম খোমেইনীর কবিতা ও শিক্ষাতেও।

যদিও এই বইটি নাজাফের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যের সংকলন, কিন্তু এতে যে নৈতিক উপদেশ দেয়া হয়েছে তা সমসাময়িক বিভেদ ও বিভ্রান্তির পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য প্রাসঙ্গিক। ইমাম খোমেইনী মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে তাদের ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করতে বলেছেন : তাদের ঝগড়া-বিবাদ কেবল ইসলামের শত্রুদের হাতে আমাদের ক্ষতি করার সুযোগ-ই তুলে দেয়। বর্তমান ইসলামী দুনিয়ায় আমরা লক্ষ্য করি যে ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা মুসলিমদের এই বিভেদের সুযোগ নিচ্ছে। ইমাম খোমেইনী ছাত্রদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের এত বেশি সম্পদ ও ক্ষমতাও নেই যে, এমনকি বস্তুবাদী মানদণ্ড অনুযায়ীও এসব ঝগড়া-বিবাদ করার কোনো অর্থ থাকবে। উম্মাহর মাঝে ব্যাপক দারিদ্র্য ও ক্ষমতাহীনতার কারণে সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্যও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। নবী ও ইমামগণের মূল লক্ষ্য ছিলো আত্মিক অভিযাত্রা ও নৈতিক উন্নতি, এবং কেবল ইসলামী শরীয়ার কিছু টার্ম শেখায় নিজেদের সন্তুষ্ট করলে চলবে না, ছাত্রদেরকে এই দিকে মনোযোগ দিতে বলেছেন ইমাম। এযুগের মুসলমানদেরও এই সতর্কবানীকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কেবলমাত্র গুটিকয়েক স্লোগান ও কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক অগ্রগতির জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কেবল নাজাফের মাদ্রাসায় নয়, বরং যেখানেই হোক এবং যাকেই ইসলামের শিক্ষা দেয়া হোক, সেই শিক্ষাকে শুধুমাত্র মৌলিক বিশ্বাস

ও প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না, বরং সাথে সাথে নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষাও দিতে হবে, যা ছিলো নবী ও ইমামগণের প্রধান মনোযোগের বিষয়।

এই বইটাকে বিভিন্ন পারস্পেক্টিভ থেকে পড়া যেতে পারে। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতার চিন্তাধারার গভীরে প্রবেশ করতে এই বইটা পড়া যেতে পারে। পড়া যেতে পারে তৎকালীন নাজাফের সমস্যাগুলির সাথে পরিচিত হতে। এ বইটা পড়া যেতে পারে এযুগের শ্রেষ্ঠ শিয়া শিক্ষকদের প্রচারিত নৈতিক শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব অথবা নৃতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু জানতে এই বই পড়া যেতে পারে; এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলোর যেকোনোটার চেয়েই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মুসলিম কমিউনিটি থেকে পাওয়া নৈতিক শিক্ষা। আমরা যেনো নৈতিক সংস্কারকে উপেক্ষা করে কেবল আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে নিজেদের সন্তুষ্ট না রাখি। আমরা যেনো ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিক পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করি, যাতে এগুলো সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এবং আমরা যেনো নবী ও ইমামগণের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দিকে মুমিনের যাত্রা শুরু করতে পারি, ইন-শা-আল্লাহ !
এই ভূমিকার বাকিটুকু হলো ইমাম খোমেইনীর জীবনী ও তার উপর কিছু মন্তব্য, বিশেষত তাঁর নৈতিক ও আত্মিক প্রশিক্ষণের উপরে – আল্লাহ তাঁকে শান্তিতে রাখুন।

ইরানের রাজধানী তেহরান ও তার দক্ষিণ-পশ্চিমের আহওয়ায শহরের মাঝামাঝি অবস্থিত খোমেইন প্রদেশে ১৯০২ সালে রুহুল্লাহ মুসাভি খোমেইনীর জন্ম হয়। যখন তাঁর ছয় মাস বয়স, তখন পিতা আয়াতুল্লাহ মুস্তাফা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে শহীদ হন। তাঁর মা 'হাজার' ছিলেন ইসলামী স্কলার আক্বা মির্জা আহমাদ মুজতাহিদ খুআনসারি-র মেয়ে। বালক অবস্থায় তাঁকে বড় করেন তাঁর মা ও ফুফু, যারা তাঁর ছয় বছর বয়সের সময় কলেরায় মারা যান। এরপর তিনি বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করেন। উনিশ বছর বয়সে খোমেইন প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে আরাক নগরীতে গমন করেন রুহুল্লাহ, এবং সেখানে সেযুগের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতা শেইখ আবদুল করিম হায়েরী-র ছাত্র হন। পরবর্তী বছরেই ছাত্র রুহুল্লাহ সহ শেইখ হায়েরী কোম নগরীতে চলে যান এবং সেখানের বিখ্যাত ধর্মীয় শিক্ষা-কেন্দ্রে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেন। ১৯৩৬ সালে শেইখ হায়েরী-র মৃত্যু পর্যন্ত কোমে পড়াশুনা করেন রুহুল্লাহ। এরপর তিনি নিজেই ধর্মতত্ত্ব, নৈতিকতা, দর্শন ও রহস্যজ্ঞানের উপর শিক্ষকতা শুরু করেন। আয়াতুল্লাহ খোমেইনী কোম-এ তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছরে পরস্পর জড়িত দর্শন ও আধ্যাত্মিক রহস্যজ্ঞানের (mysticism) সাথে পরিচিত লাভ করেন, যার স্ফূরণ ঘটেছিলো ইরানের সাফাভি শাসনকালে (ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকে)। এই দর্শন এখন পর্যন্ত সমকালীন শিয়া চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাব রেখে চলেছে।

কোমে আগমনের পর ইমাম খোমেইনী নৈতিকতা বিষয়ে আয়াতুল্লাহ মির্জা জাওয়াদ মালেকি তাবরিজির কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্লাস করা শুরু করেন। তিনি ছিলেন সুবিখ্যাত আশর আস-সালাত (নামাজের রহস্য) বইয়ের লেখক। "নামাজের রহস্য" নিয়ে ইমাম খোমেইনীও বই লিখেছিলেন : *'সির আস-সালাত : সালাত আল 'আরেফিন ইয়া মি'রাজ আল-সালিকিন"*। ১৯২৫ সালে মির্জা জাওয়াদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইমাম তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। মির্জা আবুল হাসান রাফিয়ী কাযভিনি কোমে থাকাকালীন (১৯২৩-১৯২৭) সময়ে তাঁর কাছেও আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন ইমাম। রমজান মাসের ফজরের পূর্বে বহুল পঠিত একটি দোয়ার ব্যাখ্যার জন্য জনাব কাযভিনি বিখ্যাত। পরবর্তীতে ইমাম খোমেইনীও এই দোয়ার উপরে ব্যাখ্যা লেখেন। তাঁর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের মাঝে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন "রাশাহাত আল বাহার" এর লেখক আক্বা মির্জা মুহাম্মাদ আলী শাহাবাদী, যিনি ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কোমে ছিলেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক কাজ, "সমুদ্রের ছাঁট"কে (spray from the sea – রাশাহাত আল বাহার) তুলনা করা যেতে পারে স্রষ্টার পক্ষ থেকে অনুপ্রেরণার সাথে। বলা হয় যে শাহাবাদীর কাছেই ইমাম খোমেইনী ইবন আল আরাবীর (১২৪০ খ্রি:) "ফুসুস আল হিকাম" (প্রজ্ঞার প্রান্তে) এবং এর উপরে ক্বায়সারী এর ব্যাখ্যা (১৩৫০ খ্রি:) নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

১৯২৯ সালে ইমাম খোমেইনী বিয়ে করেন এবং এক বছর পর তাঁর প্রথম ছেলে মুস্তাফার জন্ম হয়। পরবর্তীতে তাঁর আরও দুই ছেলে ও চার মেয়ের জন্ম হয় (সংশোধন : মোট তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে ছিলো ইমামের, যাদের মাঝে এক ছেলে ও দুই মেয়ে জন্মের পর মারা যায় – বাংলা অনুবাদক)। পরবর্তীতে ইরাকে থাকাকালীন সময়ে তাঁর বড় ছেলে মুস্তাফা শাহের এজেন্টদের হাতে শহীদ হন। ছোট ছেলে সাইয়্যিদ আহমাদ প্রথমে তাঁর পিতার সহকারী ও

পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতা হন।
অধ্যাত্মবাদ ও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি কোমের যে বৈরী মনোভাব ছিলো, কোমের ছাত্রাবস্থার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইমাম খোমেইনী নিজেই তা নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন। এখনও সেখানে কেউ কেউ এজাতীয় বৈরী মনোভাব লালন করে থাকে। (এ প্রসঙ্গে) প্রায়ই একটা ঘটনা বলা হয়। তখন ইমাম কোমে কেবল দর্শন পড়ানো শুরু করেছেন, তাঁর প্রথম ছেলে যখন ছোট। এমন সময় একদিন ইমামের ছেলে যে পেয়ালা থেকে পানি পান করেছিলো সেটা ব্যবহারের আগে মাদ্রাসার কয়েকজন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা মনে করে পেয়ালাটা ধুয়ে নিয়েছিলো, কারণ তাতে এক "অপবিত্র" ছেলে পানি পান করেছে, যেহেতু তার পিতা দর্শনের শিক্ষক ! ইমাম বলেছেন যে তাঁর শিক্ষক শাহাবাদী এই বৈরিতার বিরোধিতা করেছিলেন মানুষকে আধ্যাত্মিক মতাদর্শের সাথে পরিচিত করানোর মাধ্যমে, যেনো তারা নিজেরাই বুঝতে পারে যে অধ্যাত্মবাদের সাথে ইসলামের বৈরিতা নেই। ইমাম বলেন : "একবার মরহুম শাহাবাদীর (র.) কাছে একদল ব্যবসায়ী এসেছিলো, আর তিনি তাদের সাথে সেই একই আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথা বলা শুরু করলেন, যেটা সবাইকে শিক্ষা দিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে তাদের সাথে এসব বিষয়ে কথা বলা উপযুক্ত হচ্ছে কিনা। তিনি জবাব দিলেন : "তাদেরকে একবারের জন্য হলেও এই বিপ্লবী শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে দাও !" মানুষকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ফেলে কাউকে কাউকে এসব বোঝার অযোগ্য বলাকে আমি নিজেও এখন অনুচিত মনে করি।"

অধ্যাত্মবাদকে সর্বসাধারণের সামনে নিয়ে আসার জন্য ইমাম খোমেইনীর অন্যতম বিস্ময়কর প্রচেষ্টা ছিলো ইসলামী বিপ্লবের পরে সূরা আল ফাতিহার উপরে দেয়া তাঁর লেকচার। সেখান থেকেই উপরের ঘটনাটা উদ্ধৃত করা হয়েছে। বিপ্লবের পরে আয়াতুল্লাহ তালেক্বানি টেলিভিশনে কুরআনের তাফসির করতেন। বিপ্লবের প্রায় অর্ধবছর পর ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ তালেক্বানির মৃত্যু হলে একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ স্কলার টেলিভিশনে কুরআন তাফসিরের দায়িত্ব নেন। ইমাম খোমেইনী টিভি প্রোগ্রামটির জন্য অপেক্ষাকৃত সিনিয়র কাউকে নেয়ার প্রস্তাব দেন। টিভি ব্রডকাস্টের দায়িত্বে থাকা লোকজনেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইমামকেই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানাবেন। জবাবে ইমাম জানালেন যে তাঁর ঘরে ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে এলে তিনি অনুরোধ রক্ষা করবেন। ফলস্বরূপ পাওয়া গেলো সূরা আল ফাতিহার উপর এক লেকচার : কুরআনের শুরুর আয়াতগুলির এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী ছিলো যে গোটা দুনিয়া-ই আল্লাহর একটি নাম। এই লেকচারগুলোতে ইমাম আরো যুক্তি দেখান যে, ইসলামের দার্শনিকগণ, আধ্যাত্মিক সাধক এবং কবিগণ একই অন্তর্নিহিত বক্তব্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন টার্মিনোলজি ব্যবহার করেছেন। এবং তিনি দর্শকদের প্রবলভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন যেনো না বুঝে এসব ব্যক্তিদের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান না করা হয়, এমনকি যদিও তাদের ভাষা প্রচলিত মতাদর্শের বিপরীতে বলে সন্দেহ হয়। এভাবে, এই অঙ্গনে ইমামের শিক্ষা মূলত ছিলো সহনশীলতার অনুরোধ।

সহনশীলতার উপরে ইমামের জোর দেয়া কেবল অধ্যাত্ম ও কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। ইমাম খোমেইনীর ইসলামী শরীয়ার শিক্ষক শেইখ হায়েরী ছিলেন কোমে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদীর উত্তরসুরী, যিনি এই বিষয়ের সর্বোচ্চ অথরিটি হিসেবে বিবেচিত হতেন। ১৯৬১ সালে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদীরর মৃত্যুর পর ইমাম খোমেইনী ইসলামী শরীয়ার অন্যতম সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ (মারজা-ই-তাক্বলিদ) হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। এই পদলাভ করে ইমাম খোমেইনী বেশ কয়েকটি ফতোয়া জারি করেন, যেটাকে অধিকতর রক্ষণশীল আলেমগণ সন্দেহের চোখে দেখেন। শিয়া-সুন্নি উভয় ধারার শরীয়াতেই মিউজিক ও দাবা খেলাকে হারাম বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। ইমাম খোমেইনী বলেন যে কয়েক ধরণের মিউজিক অনুমোদনযোগ্য, এবং দাবা খেলাও ইসলামী আইনের পরিপন্থী নয়। ফলস্বরূপ বিপ্লবের পর থেকে ঐতিহ্যবাহী ইরানী সঙ্গীত চর্চার উন্নতি ঘটে। অধিক রক্ষণশীল শরীয়া বিশেষজ্ঞদের অসন্তুষ্টির মুখেই ইমাম খোমেইনী সমাজে অধিক বিষয়ে ভূমিকা রাখার জন্য নারীদেরকে উৎসাহ দেন।

পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের কাছে এটা ধাঁধার মত লাগে যে, যেই একই ব্যক্তি কট্টর ধর্মীয় মতের বিপরীতে দর্শন, অধ্যাত্ম, কবিতা ও মিউজিকের ব্যাপারে সহনশীলতার প্রচার করে, সেই একই ব্যক্তি কিনা ওয়েস্টার্নাইজেশনের প্রবক্তাদের প্রতি এত অসহনশীল। অসহনশীল পিপলস মুজাহিদীন অর্গানাইজেশন অব ইরান (PMOI) এর ইসলামের নামে প্রচারিত মার্কসবাদের প্রতি। অসহনশীল সালমান রুশদীর মত মানুষদের প্রতি, যারা ইসলামের নবী এবং তাঁর পরিবারকে অসম্মান করে। এই আপাতঃ বৈপরীত্য দূর হয়ে যায় যখন উপলব্ধি করা যায় যে, ইমাম খোমেইনী সহনশীলতাকে কেবলমাত্র সহনশীলতার জন্যেই গুরুত্ব দিতেন তা নয়, বরং তিনি সহনশীলতাকে গুরুত্ব দিতেন ইসলামের জন্যে। ইমাম খোমেইনীর ইসলামী দর্শনের কেন্দ্রে আছে অধ্যাত্ম, ইরফান। সুন্নী ধারায় ইসলামের

বাহ্যিক ও আত্মিক দিককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা করে রাখা হয়েছে, বিশেষত আত্মিক দিককে সুফি ধারার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত শিয়া আলেমগণের একটা বড় অংশ কর্তৃক সুফিদের অনেক শিক্ষা ও চর্চাকে ধর্মীয় জীবন ও চিন্তায় আত্মস্থ করে নেয়ার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য ধারায় আছে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক চর্চা, বা অধ্যাত্মবাদ উৎসরিত হয়েছে ইবনুল আরাবীর সুফি তত্ত্ব, সদর উদ্দিন শিরাজী (১৬৪০ খ্রি) ও হাজী সাবযাওয়ারীর (১৮৭৮ খ্রি.) দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ, (যারা উভয়েই শিয়া আলেম ছিলেন) এবং মৌলভী জালাল উদ্দিন রূমী (১২৭৩ খ্রি) ও হাফিজের (১৩৯১ খ্রি.) আধ্যাত্মিকতার কাব্যিক বহিঃপ্রকাশ থেকে। এসব কবিতাকে প্রায়ই গান ও সূরে রূপ দেয়া হয়ে থাকে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় ইরফানের চর্চাকারীরা প্রায়ই এই শিক্ষাকে গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছে। ইমাম খোমেইনীর শিক্ষক শাহাবাদী যে ধরণের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, সে অনুযায়ী ইমাম খোমেইনী এমন পদ্ধতি অবলম্বন শুরু করলেন, যার মাধ্যমে ইরফান প্রকাশ্যরূপ লাভ করতে পারে। এই পথ কোনো আকস্মিক বিপ্লবের পথ ছিলো না। ইরফানের উপর তাঁর নিজের কাজই (বই) তাঁর জীবদ্দশায় খুব একটা প্রচারিত ছিলো না। কিন্তু শিয়া চিন্তাধারার আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর উপর যে জোর দেয়া হয়েছে, তা তাঁর রাজনৈতিক ঘোষণাগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যেগুলো এই "জিহাদ আল আকবার"-এও পাওয়া যেতে পারে।

ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক ইসলামী আন্দোলনকে দেখা যেতে পারে ইসলামী অধ্যাত্মবাদকে প্রকাশ্যে আনার তাগিদের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। ইসলামী বিপ্লবটা ছিলো ইসলামকে প্রকাশ্য জনজীবনে নিয়ে আসার উপায় : যেই ইসলামকে শাহের আমলে অবদমিত করে রাখা হয়েছিলো। অধিকতর রক্ষণশীল আলেমগণ ইসলামকে জনজীবনের কেন্দ্রে নিয়ে আসার পদ্ধতিটির বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তারা এই আন্দোলনকে দেখেছিলেন ইসলামী ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি হিসেবে। বিপরীতে ইমাম খোমেইনী যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, ইসলামী শাসনকে বজায় রাখার জন্য আইনের প্রচলিত ধারণাকে পরিবর্তন করার এখতিয়ার সর্বোচ্চ ফকীহ (রাহবার) এর আছে। রক্ষণশীলগণ বিরোধিতা করেছিলেন এই বলে যে ঐতিহ্যের যেকোনোরূপ ভঙ্গ-ই ইসলামী ধারা থেকে বিচ্যুতি ঘটাবে। ইমাম খোমেইনীর পরিকল্পিত ইসলামী সরকারের যে ধরণের নেতৃত্বের প্রয়োজন, তা ইসলামী আইনশাস্ত্রের প্রচলিত ধারার আলোচনারও উর্ধ্বে। বরং এটা এক প্রকার প্রজ্ঞা, যা কেবল "বিশুদ্ধ মানব" অর্থাৎ "ইনসান কামিলের" কাছ থেকেই আশা করা যায়, যার লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উন্নতি।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর যে সহনশীলতা, যা কিনা অধিকতর রক্ষণশীল আলেমগণের মাঝে যা ছিলো না, তা পাওয়া যেতে পারে সুন্নি ইসলামের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে। প্রচলিত শিয়া মহলে সুন্নির নেতৃত্বে নামাজে দাঁড়ানোর অনুমতি নেই। ইমাম খোমেইনী এ ধরণের নামাজকে বৈধ ঘোষণা করেন এবং নিজেও প্রকাশ্যে সুন্নী আলেমের নেতৃত্বে নামাজ আদায় করেন।
ইসলামে স্বাধীন চিন্তার যে দিকগুলো আছে, ইমাম খোমেইনীর চরিত্রের নমনীয়তা ও সহনশীলতার উৎস সেটা ছিলো না; বরং এই নমনীয়তা ও সহনশীলতা ছিলো ইসলামকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাহ্যিক দিকে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি। এমন এক আন্দোলন, যা একইসাথে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন ও আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার প্রচার করে।

আধ্যাত্মিকতা ও পলিটিক্সের প্রতি ইমাম খোমেইনীর দৃষ্টিভঙ্গি খুব ভালো বোঝা যায় প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভকে তাঁর ইসলামের দাওয়াত দেওয়া থেকে। ৩রা জানুয়ারি, ১৯৯৮ সালে ইমাম খোমেইনী মস্কোতে এক ডেলিগেশন প্রেরণ করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমুলি, যিনি ইমামের দাওয়াতের চিঠি গর্বাচেভকে পৌঁছে দেন। কমিউনিজমের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেবার জন্য গর্বাচেভকে ইমাম খোমেইনী তাঁর চিঠিতে স্বাগত জানান, এবং কমিউনিস্ট আদর্শের বিপরীতে ইসলামের প্রস্তাবিত দর্শনকে বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দেন। রুশ নেতাকে ইসলামের সাথে পরিচিত করানোর জন্য ইমাম খোমেইনী দার্শনিক ফারাবী ও ইবনে সিনা, এবং আধ্যাত্মিক সাধক ইবনুল আরাবীর লেখা পড়ার পরামর্শ দেন। রক্ষণশীল আলেমগণ রাগান্বিত হয়েছিলেন যে ইমাম খোমেইনী ইসলামী আইনশাস্ত্র ও প্রচলিত ভক্তিমূলক সাহিত্যের পরিবর্তে ইসলামী চিন্তাধারাকে সুফি ও দার্শনিকদের কাজের মাধ্যমে (গর্বাচেভের কাছে) প্রকাশ করেছেন। প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ বিনয়ের সাথে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, যদিও তিনি বলেন যে সমাজে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব নিয়ে তিনি ভেবে দেখবেন। গর্বাচেভের জবাব হাঁ-বোধক না হওয়ায় ইমামকে সত্যিই খুব অখুশি মনে হয়েছিলো : ইমামের চিঠির জবাব যখন একজন সোভিয়েত ডেলিগেট তেহরানে ইমাম খোমেইনীর কাছে পড়ে শুনাচ্ছিলেন, তখন ইমাম চিঠিতে প্রকাশিত গর্বাচেভের দৃষ্টিভঙ্গির বারবার সমালোচনা

করছিলেন। আলেমগণের সমালোচনা জয় করে এধরণের অপ্রচলিত ডিপ্লোম্যাসি ইসলামী অধ্যাত্ম ও এর প্রচারের প্রতি ইমামের নিষ্ঠা-ই ফুটিয়ে তোলে। ইমাম খোমেইনীর চিন্তাধারায় অধ্যাত্মবাদ ও পলিটিক্সের যে বিরল সমাবেশ ঘটেছিলো, এটা তারও বহিঃপ্রকাশ বটে।

আধ্যাত্মিকতার উপরে ইমাম খোমেইনী বেশ কিছু বই লিখেছিলেন। কিংবা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ছোঁয়া আছে, এমন লেখাও পাওয়া যায় তাঁর। শিরোনাম দেখলেই তা বোঝা যায় :
ভোরের আগের দোয়ার ব্যাখ্যা *(শরহে আদ-দুআ আশ-শাহার)*, গার্ডিয়ানশিপ ও খেলাফতের পথে আলো *(মিসবাহ আল-হিদায়াহ আলা আল-খালিফাত ওয়া আল-বেলায়াহ)*, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া *(লিক্বআ' আল্লাহ)*, নামাজের রহস্য: আধ্যাত্মিকদের প্রার্থনা অথবা অভিযাত্রিকের মিরাজ *(সির আস-সালাত : সালাত আল-আরেফিন ইয়া মিরাজ আস-সালেকিন)*, আল ফুসুস আল হিকাম এর মন্তব্য-ব্যাখ্যা *(তালিক্বাত আলা শরহে আল ফুসুস আল হিকাম)*, "অন্তরঙ্গতার প্রদীপ" এর মন্তব্য-ব্যাখ্যা *(তালিক্বাত আলা শরহে আল-মিসবাহ আল-উনস)*, রাস আল-জালুত নামে রাসূল (সা.) ও ইমাম-চরিতের উপর ব্যাখ্যা ও মন্তব্য-ব্যাখ্যা করে দুটি বই। এবং সূরা আল ফাতিহার উপর লেকচার, "যাত্রা" এর উপর নোট *(হাশিয়েহ আলা আল-আসফার)*, নামাজের আদব *(আদাব আস-সালাত)*, রাসূল (সা.) ও ইমামগণের হাদীসের উপর ব্যাখ্যা *(চেহেল হাদীস)*।

মারজা-ই-তাক্বলিদ হওয়ার পর পলিটিকাল বিভিন্ন ঘটনা ইমাম খোমেইনীর জীবনের উপর প্রভাব রেখেছে। ১৯৬৩ সালে স্বৈরশাসনের বিরোধিতাকারী হাজার হাজার লোককে হত্যা করে শাহের বাহিনী। "উষ্কানিমূলক" বক্তব্য দেয়ার জন্য ইমাম খোমেইনীকে গ্রেফতার করে তেহরানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে "ইমাম খোমেইনী পলিটিকাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে সম্মত হয়েছেন" এমন সংবাদ প্রচার করে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। বের হয়ে ইমাম খোমেইনী এই কথা অস্বীকার করেন এবং পরবর্তীতে আবারও গ্রেফতার হন। গাড়িতে করে অজানা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। গাড়ি প্রধান সড়ক ছাড়লে ইমাম খোমেইনী আশঙ্কা করেন যে তাঁকে দূর মরুভূমিতে নিয়ে গুপ্তহত্যা করা হবে। হৃদস্পন্দন বেড়ে গিয়েছে কিনা তা দেখার জন্য বুকে হাত দিলে তিনি নিজেকে শান্ত দেখতে পেলেন। ইমাম পরবর্তীতে বলেছিলেন যে তিনি কখনোই ভয় পাননি। তাঁকে বিমান চলাচলের একটি ছোট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁকে তুরস্কে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য একটি প্লেন অপেক্ষমান ছিলো। পরবর্তী বছরে তাঁর নির্বাসনের জায়গা পরিবর্তন করে দক্ষিণ ইরাকে মাজারের শহর নাজাফে স্থানান্তরিত করা হয়। ইমাম খোমেইনী নাজাফে ১৪ বছর অবস্থান করেন, এবং জিহাদ আল-আকবার শিরোনামে সংকলিত লেকচারগুলি এই ১৪ বছরের মধ্যেই দেয়া হয়েছিলো। ১৯৭৮ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেইনীকে বহিস্কার করার জন্য ইরানের শাহ ইরাকের বাথ পার্টির (সাদ্দাম হোসেন এর দল) সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে। কুয়েত এয়ারপোর্টে আশ্রয় প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হবার পর ইমাম খোমেইনী বলেছিলেন যে প্রয়োজনে তিনি এক এয়ারপোর্ট থেকে আরেক এয়ারপোর্টে ঘুরে ঘুরে জীবন অতিবাহিত করবেন, কিন্তু তবুও চুপ করে থাকবেন না। শেষমেষ তিনি ফ্রান্সে প্রবেশ করার অনুমতি পান, এবং সেখানে প্যারিসের অদূরে নওফেল-এ-শ্যাতু-র এক বাড়িতে থাকেন। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিজয়ীর বেশে তিনি ইরানে ফিরে আসেন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামী আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে নিতান্তই সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকেও কঠোর মনোযোগ ও সাধারণ জীবনযাত্রার কারণে তিনি সুপ্রশংসিত ও পরম শ্রদ্ধেয়। বলা হয় যে ওজু করার সময় তিনি সর্বদা-ই কিবলামুখী হয়ে থাকতেন। কেনার সময় সবচেয়ে কমদামী জুতা পছন্দ করতেন। যদি তিনি অর্ধেক গ্লাস পানি খেতেন, তাহলে পরে পান করার জন্য বাকিটুকুকে ধুলা থেকে রক্ষা করতে এক টুকরা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতেন। কেউ কেউ দাবী করে যে দ্বাদশ ইমাম, ইমাম মাহদী (আ.) এর সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। ইমাম মাহদী (আ.) – প্রতীক্ষিত সেই ব্যক্তি, কেয়ামতের আগে যিনি অবিচারের বিরুদ্ধে লড়বেন। এ দাবীগুলো শিয়া ইসলামের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যেরও অংশ।

অধ্যায় – ৩ : সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ : নফসের সাথে যুদ্ধ

আমাদের জীবনের আরও একটি বছর পার হয়ে গেলো। তোমরা তরুণেরা বৃদ্ধ বয়সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, আর আমরা বৃদ্ধরা এগিয়ে যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে৷ এই শিক্ষাবর্ষে তোমরা তোমাদের পড়াশুনা ও জ্ঞানার্জনের মাত্রা সম্পর্কে জানতে পেরেছো। তোমরা জানো কতদূর তোমরা অর্জন করেছো এবং তোমাদের শিক্ষার ইমারত কতটা উঁচু হয়েছে। যাই হোক, আচরণের বিশুদ্ধতা, ধর্মীয় আচরণ শিক্ষা করা, ঐশী শিক্ষা এবং আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে তোমরা কী করেছো ? কী কী ইতিবাচক পদক্ষেপ তোমরা নিয়েছো ? তোমরা কি পরিশুদ্ধি নিয়ে, অর্থাৎ নিজের সংস্কার নিয়ে কোনো চিন্তা করেছিলে ? এই দিকে কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করেছো কি ? দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার স্বীকার করতে হচ্ছে যে তোমরা চোখে পড়ার মতো কিছু করোনি, এবং নিজের পরিবর্তন ও আত্মিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তোমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নাওনি।

অধ্যায় – ৪ : ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি পরামর্শ

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়ের (scholarly matters) পড়াশুনার পাশাপাশি ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার-ও প্রয়োজন আছে। আধ্যাত্মিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য নৈতিক পথপ্রদর্শক ও প্রশিক্ষকের প্রয়োজন, দরকার উপদেশ-পরামর্শ সেশনের। নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক সংস্কারমূলক কর্মসূচী, আচরণ ও পরিশুদ্ধির উপর ক্লাস, ঐশী জ্ঞানার্জনের (যা ছিলো নবীগণের (আ.) মিশনের মূল লক্ষ্য) দিকনির্দেশনা ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে যেটুকু মনোযোগ দেয়া হয়, তা অতি নগন্য। আধ্যাত্মিকতার পড়াশুনা এখন কমে যাচ্ছে, ফলস্বরূপ ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রগুলো ভবিষ্যতে আর নৈতিকতার উপর পণ্ডিত গড়ে তুলতে পারবে না, গড়ে তুলতে পারবে না বিশুদ্ধ-প্রাণ নৈতিক শিক্ষক, ঐশ্বরিক মানব। প্রাথমিক বিষয়ের আলোচনা-অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকার কারণে মৌলিক ও ভিত্তিমূলক বিষয়ের পড়াশুনার সুযোগ হয়ে ওঠে না। সেসব মৌলিক বিষয়, মহাগ্রন্থ আল কুরআন যা উপস্থাপন করেছে এবং মহানবী (সা.) এবং অন্যান্য নবী (আ.) ও আউলিয়াগণ (আ.) যা উপস্থাপন করেছেন। পণ্ডিতসমাজের উল্লেখযোগ্য আইনজ্ঞ ও খ্যাতনামা প্রফেসরগণের উচিত তাঁদের বিভিন্ন লেকচার ও আলোচনায় মানুষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে গড়ে তোলা; উচিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলির উপর অধিক জোর দেয়া। ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদের জন্য পাণ্ডিত্য ও আত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি তাদের মহান দায়িত্বের প্রতিও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

অধ্যায় – ৫ : ধর্মশিক্ষার ছাত্রদের প্রতি পরামর্শ

আজকে তোমরা যারা এই মাদ্রাসাগুলোয় পড়াশুনা করছো, যারা আগামী দিনে সমাজের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব নেবে – ভেবোনা যে কেবলমাত্র কিছু ধর্মীয় টার্ম শেখা-ই তোমাদের দায়িত্ব; কারণ তোমাদের অন্যান্য দায়িত্বও রয়েছে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে তোমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেনো যখন তোমরা কোনো গ্রাম বা শহরে যাবে, তখন সেখানের মানুষদের গাইড করতে পারবে এবং তাদেরকে আত্মশুদ্ধির পথ দেখাতে পারবে। যখন তোমরা ধর্মীয় আইনশিক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়বে, তখন যেনো তোমরা নিজেরাই পরিশোধিত ও সুসংস্কৃত হও, যাতে মানুষকে ইসলামের নৈতিক আদবকায়দা, রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারো – এটাই কাম্য। আল্লাহ না করুন যদি তোমরা শিক্ষাকেন্দ্রে এসে নিজেদের সংস্কার করতে না পারো, আধ্যাত্মিক আদর্শকে উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে – আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন – যেখানেই তোমরা যাবে, (তোমাদের শিক্ষায়) মানুষ বিকৃতমনা হবে, এবং তোমরা মানুষকে ইসলাম ও আলেমগণের ব্যাপারে নিচু ধারণা দেবে।

তোমাদের এক গুরুদায়িত্ব রয়েছে। তোমরা যদি মাদ্রাসায় নিজেদের দায়িত্ব পালন না করো, নিজের পরিশুদ্ধির পরিকল্পনা না করো; যদি শুধুমাত্র কিছু টার্ম শেখা, আইনের কিছু ইস্যু কিংবা বিচারশাস্ত্র শেখার পিছনে ছোটো, তাহলে তোমরা ইসলাম ও ইসলামী সমাজের যে ক্ষতি করবে – খোদা আমাদের সেটা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ রক্ষা করুন, কিন্তু তোমাদের দ্বারা মানুষকে বিকৃত ও বিপথগামী করা সম্ভব। যদি তোমাদের কাজ, কর্ম ও অনুচিত আচণের কারণে কোনো ব্যক্তি পথচ্যুত হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তুমি সবচে বড় কবিরা গুনাহর দোষে দোষী হবে, আর তোমার তওবা আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়াও কঠিন হবে। অনুরূপভাবে, (যদি তোমাদের কাজ, কর্ম ও আচরণের কারণে) একজন ব্যক্তি সঠিক পথ খুঁজে পায়, তবে একটা বর্ণনা অনুযায়ী – সেটা ঐ সকল কিছুর চেয়ে উত্তম, যার উপর সূর্যরশ্মি বিকীরিত হয়। তোমাদের দায়িত্ব অনেক কঠিন। সাধারণ মানুষের চেয়ে তোমাদের দায়িত্ব বেশি। সাধারণ মানুষের জন্য কত কিছুই বৈধ, যা তোমাদের জন্য অনুমিত নয়, এমনকি হারামও হতে পারে ! অনেককিছুই সাধারণ মানুষের জন্য বৈধ, কিন্তু তোমরা তা করো, সেটা মানুষ পছন্দ করে না। অনৈতিক কাজের সামনে তোমরা চুপ করে থাকবে, এটা তারা প্রত্যাশা করে না, আর আল্লাহ না করুন যদি তোমরা সেগুলো করো, তবে মানুষ ইসলাম সম্পর্কেই খারাপ ধারণা করে বসবে, আলেম সমাজ সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে।

সমস্যা হলো : মানুষ যদি তোমাদের কাজকর্মকে প্রত্যাশার বিপরীত দেখতে পায়, তাহলে তারা ধর্ম থেকেই সরে যায়। তারা গোটা আলেম সমাজ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, কোনো নির্দিষ্ট একজনের থেকে নয়। যদি তারা শুধু ঐ একজন আলেমের থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিতো এবং শুধু ঐ ব্যক্তির ব্যাপারেই নিচু ধারণা করতো ! কিন্তু তারা যদি একজন আলেমকে প্রত্যাশিত আচরণের বাইরে অনুচিত কাজ করতে দেখে, তারা বিষয়টাকে এভাবে পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ করে দেখে না যে একই সময়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও খারাপ ও বিকৃতরুচির লোক আছে, এবং অফিস-কর্মচারীদের মাঝেও দুর্নীতি ও নোংরা কাজকর্ম দেখা যায়, সুতরাং এটা সম্ভব যে আলেমগণের মাঝেও এক বা একাধিক অধার্মিক ও পথচ্যুত মানুষ থাকতে পারে। সুতরাং, যদি একজন মুদি দোকানী একটা দোষ করে, তখন বলা হয় যে ওমুক দোকানী একজন খারাপ লোক। যদি একজন ফার্মাসিস্ট কোনো নোংরা কাজের অপরাধে দোষী হয়, বলা হয় যে ওমুক ফার্মাসিস্ট খারাপ লোক। কিন্তু যদি একজন দায়ী কোনো অনুচিত কাজ করে, তখন লোকে বলে না যে ওমুক ধর্মপ্রচারকটি খারাপ, বরং বলা হয় যে ধর্মপ্রচারকেরাই খারাপ !

জানাশোনা মানুষের দায়িত্ব বড় কঠিন; অন্যদের তুলনায় উলামাগণের দায়িত্ব বেশি। উলামাগণের দায়িত্ব বিষয়ে উসুলে কাফি কিংবা ওয়াসসাইল বইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলো যদি দেখো, তাহলে দেখবে কিভাবে তারা জানাশোনা মানুষদের কঠিন দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতার কথা বর্ণনা করেছে ! বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, যখন আত্মা গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন আর তওবা করার সুযোগ থাকে না, এবং তখন কারো তওবা কবুল-ও হবে না। অবশ্য যদিও অজ্ঞদের তওবা আল্লাহ তাদের জীবনের শেষ মিনিট পর্যন্ত কবুল করে থাকেন। আরেকটা বর্ণনা অনুযায়ী কোনো আলেমের একটি গুনাহ ক্ষমা হবার আগে একজন অজ্ঞ মানুষের ৭০টি পাপ ক্ষমা করা হবে। এর কারণ হলো একজন আলেমের পাপ ইসলাম ও ইসলামী সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যদি কোনো অসভ্য মূর্খ মানুষ একটা পাপ করে, সে কেবল নিজেরই দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। কিন্তু যদি একজন আলেম পথচ্যুত হয়, যদি সে নোংরা কাজে লিপ্ত হয়, সে গোটা

একটা দুনিয়াকে (আলম) নষ্ট করে। সে ইসলাম ও ইসলামের উলামাদের ক্ষতিসাধন করে।
আরেকটা বর্ণনা অনুযায়ী জাহান্নামের বাসিন্দাদের ঐসব আলেমের দুর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট দেয়া হবে, যাদের কাজ ('আমল) তাদের জ্ঞান ('ইলম) মোতাবেক ছিলো না। ঠিক এই কারণেই, ইসলাম ও ইসলামী সমাজের লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে এই দুনিয়ায় একজন আলেম ও একজন অজ্ঞ ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য আছে। কোনো আলেম যদি পথচ্যুত হয়, তাহলে খুবই সম্ভব যে তার গোটা কমিউনিটিই ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আবার একজন আলেম যদি বিশুদ্ধ হন এবং ইসলামী আচরণবিধি ও নীতি-নৈতিকতা মেনে চলেন, তিনি গোটা কমিউনিটিকেই পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করবেন। এই গ্রীষ্মে আমি কয়েকটা এলাকায় গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম একটা এলাকার মানুষজন আচার-ব্যবহারে বেশ ভালো, তাদের আচার-আচরণে ধার্মিকতার ছাপ। আসল ব্যাপার হলো তাদের মাঝে একজন আলেম ছিলেন, যিনি নিজে ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন। যদি কোনো সমাজে, এলাকায় কিংবা রাষ্ট্রে একজন ন্যায়পরায়ন ধার্মিক আলেম বাস করেন, শুধু তাঁর উপস্থিতিই ঐ এলাকার মানুষের পথপ্রদর্শন ও পরিশুদ্ধিকে উন্নত করবে, এমনকি যদিও তিনি মৌখিকভাবে দাওয়াত দেয়া, গাইড করা ইত্যাদি না করেন। আমরা এমন মানুষকে দেখেছি যাঁর কেবল উপস্থিতিই শিক্ষাগ্রহণ ঘটায়, শুধুমাত্র তাদেরকে দেখলে, তাদের দিকে তাকালেই মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে তেহরানের সম্পর্কে আমার কাছে যদ্দুর খবর আছে, সেখানে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকার অবস্থা ভিন্ন। যে এলাকায় একজন বিশুদ্ধ আলেম বাস করেন, সেখানের মানুষের নৈতিকতা উন্নত, ঈমান দৃঢ়। আরেক এলাকায়, যেখানে এক দূর্নীতিগ্রস্ত লোক পাগড়ি পরে, এবং সে নামাজের ইমাম-ও হয়েছে, ব্যবসা খুলে বসেছে, লক্ষ্য করে দেখবে সেখানের মানুষেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদেরকে দূষিত করা হয়েছে, বিকৃত করা হয়েছে। এটা সেই একই দূষণ, জাহান্নামের বাসিন্দারা যার দুর্গন্ধ দ্বারা শাস্তি ভোগ করবে। এটা সেই একই দুর্গন্ধ, যা শয়তান আলেমরা দুনিয়ায় বয়ে নিয়ে এসেছে, যার দুর্গন্ধে জাহান্নামীদের শাস্তি দেয়া হবে; এরা সেইসব কর্মহীন আলেম, বিকৃতমনা আলেম। বিষয়টা এমন না যে তাদের দ্বারা জাহান্নামীরা কষ্ট পাবে কারণ তাদের (অর্থাৎ সেসব আলেমদের) সাথে কিছু (পাপ) যুক্ত হবে, বরং পরকালে এই আলেমের কপালে যা ঘটবে, তা এই দুনিয়াতেই প্রস্তুত করা হয়েছে। আমরা যা করি তার বাইরে আমাদেরকে কিছুই দেয়া হয় না। একজন আলেম যদি দুর্নীতিগ্রস্ত ও খারাপ হয়, তবে সে গোটা সমাজকেই নষ্ট করে ফেলে, যদিও এই দুনিয়ায় আমরা সেটার দুর্গন্ধ বুঝতে পারি না। কিন্তু পরকালে সেটা টের পাওয়া যাবে। কোনো অসভ্য-মূর্খ মানুষের ক্ষমতা নেই যে ইসলামি সোসাইটিতে সেই পরিমাণ দূর্নীতি ও দূষণ প্রবেশ করাবে। অসভ্য-মূর্খ মানুষেরা কখনো নিজেদেরকে ইমাম কিংবা ইমাম মাহদি দাবী করবে না, কিংবা নবীও দাবী করবে না, অথবা বলবে না যে তার কাছে ওহী নাযিল হয়েছে। বরং এটা হলো দুর্নীতিগ্রস্ত আলেমদের কাজ, যারা দুনিয়াকে নষ্ট করে : "যদি একজন আলেম নষ্ট হয়, গোটা একটা দুনিয়া (আলম)-ই নষ্ট হয়ে যায়।"

অধ্যায় – ৬ : আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির গুরুত্ব

যারা নিত্য-নতুন ধর্ম তৈরী করেছে, অসংখ্য মানুষকে বিপথগামী করেছে, তাদের বেশিরভাগই স্কলার ছিলো। তাদের কেউ কেউ এমনকি ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশুনা করেছে। এমনকি বিভ্রান্ত মাযহাবগুলির একটির প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছে। কিন্তু যেহেতু জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তার আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা ছিলো না, যেহেতু সে আল্লাহর রাস্তায় অগ্রসর হয়নি এবং যেহেতু সে নিজের কলুষ দূর করেনি, সুতরাং সে ধিক্কারজনক অবস্থা বয়ে এনেছে। মানুষ যদি তার আত্মার গভীর থেকে কলুষকে দূর না করে, তাহলে যে শুধু তার সকল পড়াশুনা-ই ব্যর্থ হয়ে যাবে তা নয়, বরং উল্টা তা ক্ষতিকর হবে। যখন এসব শিক্ষাকেন্দ্রে জ্ঞানের ভিতরে শয়তানের প্রবেশ ঘটবে, তখন সেখান থেকে কেবল খারাপ জিনিস-ই বেরিয়ে আসবে : শিকড়, শাখা-প্রশাখাসুদ্ধ এক বিষবৃক্ষ। নোংরা অপরিষ্কার হৃদয়ে এসব দ্বীনি জ্ঞান যত বেশিই জড়ো করা হোক না কেনো, সেটা কেবল অন্তরের উপরে কালো আবরণকেই গভীর করবে। যে আত্মা অপবিত্র, জ্ঞান তার উপরে এক কালো চাদর : আল ইলম হুয়া আল হিজাব আল আকবার (জ্ঞান হলো সবচেয়ে বড় আবরণ)।

তাই, একজন আলেমের নীতিহীনতা ইসলামের যে ক্ষতি করে, আর কারো নীতিহীনতা সে ক্ষতি করতে পারে না। জ্ঞান হলো আলো, কিন্তু কালো দূষিত হৃদয়ে সেটা কেবল অন্ধকার ও কলুষকেই বৃদ্ধি করে। যে "জ্ঞান" মানুষকে খোদার নিকটবর্তী করে, সেটাই আবার দুনিয়ালোভী মানুষকে সর্বশক্তিমান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। এমনকি একত্ববাদ – তাওহীদের জ্ঞান – সেটাও যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়, সেটা হয়ে যায় অন্ধকার এক আবরণ, কারণ সেটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে লিপ্ত হওয়ার জন্যে অর্জিত। কেউ যদি সুপরিচিত চৌদ্দ রকমের সবগুলি উপায়েই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু সেটা যদি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এই তেলাওয়াত তার জন্য কিছুই বয়ে আনবে না, আল্লাহর থেকে দূরত্ব ও (অন্তরের উপর) আবরণ ছাড়া। তুমি যদি কিছুটা কষ্ট করো, পড়াশুনা করো, তাহলে তুমি আলেম হতে পারবে বটে, কিন্তু জেনে রাখো যে আলেম হওয়া ও পরিশুদ্ধ হওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে।

আমাদের প্রয়াত শিক্ষক শাইখ আবদুল করিম হায়েরী ইয়াযদী (র.) বলেছেন, *"লোকে বলে : 'মোল্লা হওয়া কতই না সহজ, আর মানুষ হওয়া কতই না কঠিন' – কথাটা আসলে ঠিক নয়। বরং বলা উচিত : 'মোল্লা হওয়া কতই না কঠিন, আর মানুষ হওয়া তো অসম্ভব !'"*

পবিত্র মানবীয় গুণাবলী অর্জন করা তোমাদের এক গুরু দায়িত্ব। তোমরা এখন ধর্মতত্ত্ব পড়াশুনায় ব্যস্ত; শিখছো ফিকাহ, যা খুব সম্মানজনক ব্যাপার – মনে কোরো না যে এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার, ভেবো না যে তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি এমনি এমনিই পালন হয়ে যাবে। যদি আল্লাহর নিকটবর্তী হবার জন্য খাঁটি নিয়ত না থাকে, তাহলে এসব ধর্মশিক্ষা কোনোই কাজে আসবে না। আল্লাহ মাফ করুন, কিন্তু যদি তোমাদের এই পড়াশুনা আল্লাহর জন্যে না হয়, বরং আত্মতৃপ্তি, পদ-পদবী-ক্ষমতা, সম্মান ইত্যাদির লোভে হয়; তাহলে তুমি নিজের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই উপার্জন করবে না। এইযে এত ধর্মীয় টার্ম শেখা – যদি এগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে পুরোটাই ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বয়ে আনবে না।

এত ধর্মীয় টার্ম শেখা – যদি এর সাথে সাথে আত্মশুদ্ধি ও তাক্বওয়া অর্জন না হয়, তাহলে সেটা মুসলিম কমিউনিটির জন্য এই দুনিয়া ও পরকালে ক্ষতি-ই বয়ে আনবে। কেবলমাত্র কিছু টার্মিনোলজি শেখাটা কাজের নয়। এমনকি একত্ববাদের জ্ঞান (ইলম আত-তাওহীদ) – যদি এই জ্ঞানের সাথে সাথে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা না যায়, তাহলে দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই আসবে না। দুনিয়ায় কত মানুষ তাওহীদের জ্ঞান নিয়ে আলেম হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে ! তোমাদের যেই জ্ঞান আছে, আরো কত মানুষের এই একই জ্ঞান ছিলো, এমনকি হয়তো বেশিও, কিন্তু তারা পথচ্যুত ছিলো, নিজেদের সংস্কার করেনি; সুতরাং যখন তারা সমাজে (আলেম পরিচিতি সহকারে) প্রবেশ করলো, তখন অসংখ্য মানুষকে নষ্ট করলো, বিভ্রান্ত করলো।

এই নিষ্প্রাণ ধর্মীয় টার্মিনোলজি, যদি এর পাশাপাশি তাক্বওয়া ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন না হয়, তাহলে যত বেশি এসব ধর্মীয় জ্ঞান একজনের মাথায় ঢুকবে, ততই তার অহংকার বেড়ে যাবে। যেই হতভাগ্য আলেম নিজের অহংকারের কাছে পরাজিত হয়েছে, সে নিজের কিংবা সমাজের সংস্কার করতে পারে না; এবং এর ফলাফল হিসেবে আসবে কেবলই ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি। বছরের পর বছর ধর্মীয় ফান্ডের টাকা নষ্ট করে পড়াশুনা করে,

বেতন-ভাতা ইত্যাদি নিয়ে সে ইসলাম ও মুসলমানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। জাতি তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে। মাদ্রাসায় এতসব আলোচনা, ক্লাস — ইত্যাদি তখন প্রকৃত ইসলামের দুনিয়ায় প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, বাধা হয়ে দাঁড়াবে কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে : উপরন্তু এটাও সম্ভব যে তার (কলুষিত আলেমের) উপস্থিতি-ই সমাজকে ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা জানার পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

আমি পড়াশুনা করতে নিষেধ করছি না, বলছি না যে তোমাদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন নেই; বরং তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে; কারণ যদি তোমরা সমাজের কাজে লাগতে চাও, ইসলামের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে চাও, জাতিকে ইসলামের ব্যাপারে সচেতন করতে চাও, ইসলামের মৌলিক আক্বীদাকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে ইসলামী আইনের মৌলিক জ্ঞানের ভিত্তি খুব দৃঢ় হতে হবে, এ বিষয়ে তোমাদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ না করুন তোমরা যদি সে জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ হও, তাহলে মাদ্রাসায় থাকার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। (সেক্ষেত্রে) তোমরা ধর্মশিক্ষার ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত ভাতা গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্যই জ্ঞান অর্জনের দরকার আছে। ফিকাহ ও উসুল শিক্ষায় তোমরা যেমন কষ্ট করো, তেমনি নিজের সংস্কারের জন্যও কষ্ট করতে হবে। জ্ঞানার্জনের পথে নেয়া প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে সাথে প্রবৃত্তির দমনের পথেও একটি করে পদক্ষেপ নিতে হবে : প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের জন্য, আধ্যাত্মিকতা ও তাক্বওয়া অর্জনের জন্য।
ফিকাহ, উসুল ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করাটা হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি, পবিত্র গুণাবলী, আচরণ ও ঐশী জ্ঞান অর্জনের সূচনা। গোটা জীবনটা কেবল সূচনায় পড়ে থেকো না যাতে তোমরা সমাপ্তিটা ভুলে যাও। তোমরা এসব জ্ঞান অর্জন করছো এক সুউচ্চ পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য : খোদাকে জানা এবং নিজেকে বিশুদ্ধ করা। তোমাদের কাজের ফলাফল ও প্রভাব উপলব্ধি করার জন্য প্ল্যান করা উচিত, সেইসাথে মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়া উচিত।

যখন তোমরা মাদ্রাসাজীবন শুরু করো, তখন আর সবকিছুর আগে নিজেকে সংস্কারের পরিকল্পনা করা উচিত। মাদ্রাসায় থাকাকালীন সময়ে পড়াশুনার পাশাপাশি নিজেদের বিশুদ্ধ করা উচিত, যাতে তোমরা যখন মাদ্রাসা ছেড়ে গিয়ে কোনো শহর বা জেলার ইমাম হও, তারা যেনো তোমার দ্বারা লাভবান হতে পারে, তোমার কাছ থেকে উপদেশ নিতে পারে, এবং তোমার নৈতিক গুণাবলী, আচরণ, কর্ম ইত্যাদি দেখে যেনো তারা নিজেদেরকে বিশুদ্ধ করতে পারে। মানুষের মধ্যে প্রবেশ করার আগে নিজেকে সংস্কার করার চেষ্টা করো। এখন, যখন তোমাদের সময়-সুযোগ আছে, এখন যদি তোমরা নিজেদের সংস্কার করতে না পারো, তাহলে যখন মানুষ তোমাদের কাছে আসতে শুরু করবে, তখন আর নিজেদের সংস্কারের সুযোগ পাবে না।

অনেক জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, অধ্যয়ন ও আত্মিক বিশুদ্ধি অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি এই দাড়ি আর পাগড়িও ! যখন পাগড়িটা একটু বড় হয়, দাড়ি একটু লম্বা হয় — এমন মানুষ যদি নিজেকে পরিশুদ্ধ না করে, তাহলে এটাই অধ্যয়ন থেকে দূরে সরিয়ে নেবে, সীমাবদ্ধ করে ফেলবে। নিজের দাম্ভিক সত্তাকে পায়ে মাড়িয়ে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে আরেকজনের পায়ের কাছে বসাটা খুব কঠিন। শাইখ তুসী (র.) বায়ান্ন বছর বয়সেও ক্লাসে যেতেন; অথচ বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বেশ কিছু বই লিখেছিলেন ! তাঁর "তাহযীব" সম্ভবত সেই সময়েই লিখিত হয়েছিলো।
তবুও বায়ান্ন বছর বয়সে তিনি প্রয়াত সাইয়্যিদ মুর্তাজার (র.) ক্লাসে যোগ দিতেন, এবং তাঁর সমান মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ না করুন সৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার আগেই না কারো দাড়ি সাদা হয়ে যায়, পাগড়ি আকারে বড় হয়ে যায়; আর সে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার আশীর্বাদ থকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং দাড়ি সাদা হবার আগেই কাজে লেগে পড়ো; মানুষের নজরে আসার আগে নিজের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করো ! আল্লাহ না করুন কেউ না আবার এই উদ্দেশ্যে নিজেকে গড়ে তোলে যে সে লোকের নজরে পড়বে, মানুষের মাঝে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবে, প্রভাবশালী হবে আর এসব করে সে তার নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলবে।

নফসের উপর কর্তৃত্ব হারানোর আগেই নিজেকে গড়ে তোলো, নিজের সংস্কার করো ! সুঅভ্যাস দ্বারা নিজেকে সাজিয়ে তোলো, নিজের দোষগুলি দূর করো ! তোমাদের শিক্ষাগ্রহণ ও আলোচনায় বিশুদ্ধ হয়ে ওঠো, যেনো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে পারো ! যদি কারো সৎ নিয়ত না থাকে, তাহলে সে স্বর্গীয় গৃহ থেকে অনেক দূরে সরে পড়বে।

আল্লাহ না করুন; কখনো এমনটা যেনো না হয় যে সত্তর বছর ধরে তোমরা সর্বশক্তিমান খোদার থেকে দূরে ছিলে ! তোমরা কি সেই "পাথর" এর গল্প শুনেছো, যেটাকে দোযখে ফেলা হয়েছিলো ? সত্তর বছর পর সেটার পতনের শব্দ শোনা গিয়েছিলো। একটা বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূল (তাঁর ও তাঁর বংশধরের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক) বলেছেন : সেটা ছিলো এক বৃদ্ধ লোক, যে সত্তর বছর বয়সে মারা গিয়েছিলো, আর এই সত্তর বছর ধরেই সে জাহান্নামের ভিতরে পড়ছিলো। সাবধান থাকো, যেনো মাদ্রাসায় তোমার নিজের শ্রম আর কপালের ঘাম দিয়ে পঞ্চাশ বা তার কম-বেশি সময়ে তোমরা যেনো দোযখে পৌঁছে না যাও ! সময় থাকতে এখনই চিন্তা করো ! আত্মার পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের পথে পরিকল্পনা করো, এবং নিজের চারিত্রিক সংস্কার সাধন করো।

নিজের জন্য একজন নৈতিক শিক্ষক নির্ধারণ করে নাও; উপদেশ-পরামর্শ-সতর্কীকরণ সেশন আয়োজন করো। তুমি নিজে নিজের সংস্কার করতে পারবে না। নৈতিক শিক্ষাদান, উপদেশ ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কোনো স্থান যদি মাদ্রাসায় না থাকে, তাহলে মাদ্রাসাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ফিকাহ ও উসুল (আইন ও তার মূলনীতি) শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রয়োজন; প্রতিটা বিশেষ পড়াশুনা ও দক্ষতা অর্জনের জন্যই শিক্ষক অপরিহার্য, এবং আত্মতুষ্টি ও নাক-উঁচু ভাব নিয়ে কেউ-ই কোনো বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারে না – অথচ এটা কী করে সম্ভব যে আত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে, যা কিনা অত্যন্ত কঠিন একটি বিদ্যা, সেটার জন্য শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের কোনো প্রয়োজন হবে না, মানুষ সেটা নিজে নিজে এমনি এমনিই পেরে যাবে, অথচ যেখানে এই আধ্যাত্মিকতার চর্চাই ছিলো নবীগণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ! আমি বিভিন্ন সময়ে শুনেছি যে প্রয়াত শাইখ মুর্তাজা আনসারী ছিলেন সাইয়্যিদ আলী ইবনে সাইয়্যিদ মুহাম্মাদের ছাত্র, যিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন।

স্রষ্টার প্রেরিত পুরুষদের প্রেরণ করা হয়েছিলো মানুষকে প্রশিক্ষিত করার জন্য, মানবতাবোধ উন্নত করার জন্য, এবং মানুষের মাঝ থেকে কদর্যতা, কলুষতা, দূর্নীতি ও অনৈতিক কাজ দূর করার জন্য। তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো মানুষকে সুন্দর আচরণ ও সদগুণাবলীর সাথে পরিচিত করানোর জন্য : *"আমার সৃষ্টি হয়েছে মহান গুণাবলী (মাকারিম আল আখলাক) পূর্ণ করার জন্য।"* (উল্লিখিত উক্তিটি সূরা কলম, ৬৮:৪ নং আয়াতের তাফসিরে মুহাম্মাদ (সা.) এর উক্তি – অনুবাদক।) এই জ্ঞান সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নিকট এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে এজন্যে তিনি নবীগণকের প্রেরণ করেছেন; অথচ আমাদের মাদ্রাসায় আলেমদের মাঝে এই জ্ঞানের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেখা যায় না। কেউ এটাকে যোগ্য মর্যাদা দেয় না। মাদ্রাসায় আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যজ্ঞান বিষয়ে পর্যাপ্ত চর্চার অভাবে বস্তুবাদী দুনিয়াবী বিষয় এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যে সেটা এমনকি আলেমসমাজের ভিতরে ঢুকে পড়েছে এবং তাদের অনেককেই পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা (রুহানিয়াত) থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ক্ষেত্রবিশেষে দুনিয়াবী বিষয় আলেমদেরকে এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছে যে তাদের অনেকে এমনকি রুহানিয়াত অর্থ-ই জানে না ! জানে না আলেমগণেরর দায়িত্ব কী কী এবং তাদের কাজকর্ম কেমন হওয়া উচিত। তাদের কেউ কেউ পরিকল্পনা করে যে কেবল কয়েকটা শব্দ শিখবে, নিজেদের লোকালয়ে বা অন্য কোথাও ফিরে যাবে, বিভিন্ন পদ-পদবী দখল করে বসবে, আর সেজন্যে অন্যদের সাথে লড়াই করবে। যেমনটা এক লোক বলেছিলো : *"আমাকে আগে শরহে লুমআহ (শরীয়া সংক্রান্ত গ্রন্থ) শিখতে দাও, তারপর আমি জানি গ্রামের মোড়লের সাথে ঠিক ঠিক কী করতে হবে।"* এমন হোয়ো না যে প্রথম থেকেই তুমি পড়াশুনা করবে কারো পদ-পদবী দখল করার উদ্দেশ্যে; পড়াশুনা করবে এই নিয়তে যে তুমি কোনো গ্রাম বা শহরের মোড়ল হয়ে বসবে। তুমি তোমার স্বার্থপর কামনা ও মন্দ ইচ্ছাগুলো পূরণ করতে পারবে হয়তো, কিন্তু নিজের ও ইসলামী সমাজের জন্য তুমি ক্ষতি আর দূর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না। মুয়াবিয়াহ-ও দীর্ঘদিন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলো, কিন্তু নিজের জন্য সে অভিশাপ, ঘৃণা ও পরকালের অনন্ত শাস্তি ছাড়া উপকারী কোনো কিছু অর্জন করতে পারেনি।

নিজেদের সংস্কার করা তোমাদের জন্যে খুব জরুরি; যাতে তোমরা যখন কোনো সমাজ বা গোত্রের প্রধান হও, তোমরা যেনো তাদেরকেও পরিশুদ্ধ করতে পারো। কোনো সমাজ সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ নিতে হলে তোমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ইসলাম ও মুসলিমের খেদমত করা।
যদি তুমি খোদার তরে পদক্ষেপ নাও, তবে তিনিই তো হৃদয় পরিবর্তনকারী ! তিনিই তোমার দিকে মানুষের অন্তর পরিবর্তিত করে দেবেন : *"নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, করুণাময় (আল্লাহ) তাদের জন্য (মুমিনদের অন্তরে) ভালোবাসা দান করবেন।" (সূরা মারইয়াম, ১৯:৯৬)*
আল্লাহর দিকে যাত্রার পথে কিছুটা কষ্ট করো, নিজেকে নিবেদিত করো। খোদা তোমাকে প্রতিদান দেবেন; যদি এই

দুনিয়ায় না হয় তো পরকালে তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। যদি এই দুনিয়াতে তোমার আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই চাওয়া পাওয়ার না থাকে, তাহলে এর চেয়ে উত্তম আর কী-ই বা হতে পারে ! এই দুনিয়া কিছুই না। এই জাঁকজমক, এই নাম-যশ এগুলো সবই কিছুদিন পর শেষ হয়ে যাবে, যেভাবে মানুষের চোখের সামনে দিয়ে স্বপ্ন পার হয়ে যায়; কিন্তু অপর দুনিয়ার পুরস্কার অসীম, এবং তা কখনোই শেষ হবে না।

অধ্যায় – ৭ : ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি সতর্কবাণী

এটা খুবই সম্ভব যে নোংরা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে শয়তানি চক্র নৈতিক ও আত্ম-সংস্কারমূলক কর্মসূচীকে মূল্যহীন হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করবে; মিম্বরে বসে উপদেশ দেয়া, খুৎবা দেয়া ইত্যাদিকে "স্কলারদের জন্য বেমানান" হিসেবে উপস্থাপন করবে; এবং যেসব পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের যোগ্যতা আছে মাদ্রাসাগুলোর সংস্কার সাধন করার, তাদের কাজকর্মকে বাধাগ্রস্ত করবে, তাদেরকে "মিম্বরী" (অর্থাৎ খুৎবা-অলা) বলে উপহাস করবে। আজকে এমনকি কোনো কোনো মাদ্রাসায় মিম্বরে বসে খুৎবা দেয়াকে অপমানজনক মনে করা হয় ! তারা ভুলে যায় যে বিশ্বাসীদের নেতা ইমাম আলী (আ.) নিজে একজন মিম্বরী (খুৎবা দানকারী) ছিলেন। মিম্বরে বসেই তিনি মানুষকে তিরস্কার করতেন, সতর্ক করতেন, সচেতন করতেন, দিকনির্দেশনা দিতেন। অন্যান্য ইমামগণও (আ.) এমনটাই ছিলেন।

সম্ভবত গোপন এজেন্টরা মাদ্রাসা থেকে নীতি ও আধ্যাত্মিকতাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই খারাপ জিনিসটি ঢুকিয়ে দিয়েছে; ফলশ্রুতিতে মাদ্রাসাগুলো দুর্বল ও নীতিহীন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ না করুন; দল তৈরী করা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি ও দ্বন্দ্ব যেনো মাদ্রাসায় অনুপ্রবেশ না করে। মাদ্রাসার লোকেরা একে অপরের সাথে মারামারি করছে, একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে লাগছে, একে অপরকে অপমান করছে ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। ইসলামী কমিউনিটিতে তারা অসম্মানিত, তাই শত্রুরা এবং বিদেশীরা মাদ্রাসার উপর প্রভাব খাটাতে পারছে এবং মাদ্রাসাকে শেষ করে দিচ্ছে। এই খারাপ লোকগুলো জানে যে মাদ্রাসার প্রতি এদেশের মানুষের সমর্থন আছে। আর যতদিন জাতি সমর্থন দিচ্ছে মাদ্রাসাকে, ততদিন তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা কিংবা তাদের বিরুদ্ধে লড়ে জেতা যাবে না। কিন্তু যখন একটা সময়ে মাদ্রাসার লোকজন ও ছাত্রদের মাঝে ইসলামী আচরণ ও নৈতিকতার অভাব প্রকাশ পাবে, তারা পরস্পরের সাথে মারামারি করবে, পরস্পরবিরোধী দল তৈরী করবে, আত্ম-সংস্কার ও পরিশুদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করবে না, অনুপযুক্ত কাজে নিজেদের হাত নোংরা করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসা ও আলেমগণ সম্পর্কে মুসলিম জাতি খারাপ ধারণা করবে। ফলশ্রুতিতে তাদের জনসমর্থন হারিয়ে যাবে, এবং একটা পর্যায়ে শত্রুরা এখানে প্রভাব খাটানো সুযোগ পেয়ে যাবে। যদি দেখো যে কোনো আলেম বা মারজা'কে (মারজা-ই-তাক্বলিদ = সকল বিষয়ে অনুসরণযোগ্য আলেম) সরকার ভয় পাচ্ছে, গুরুত্ব দিচ্ছে, তখন বুঝবে যে এর কারণ হলো এরা (সরকার) জনগণের থেকে লাভ উঠায়, আবার একইসাথে জনগণকে ভয়ও পায়। তারা আশঙ্কা করে যে, যদি তারা কোনো আলেমের প্রতি ঘৃণা, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাহলে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কিন্তু যদি আলেমরাই একে অপরের বিরোধিতা করে, একজন আরেকজনকে অসম্মান করে, এবং ইসলামী নৈতিক আচরণবিধি অনুযায়ী আচরণ না করে, তাহলে সমাজে তাদের যে অবস্থান রয়েছে, তা থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে পড়বে, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে। মানুষ তোমাদেরকে রুহানি (আলেম, আধ্যাত্মিক ব্যক্তি) হিসেবে দেখতে চায়। দেখতে চায় ইসলামী আদব-কায়দা পালনকারী হিসেবে, দেখতে চায় হিজবুল্লাহ (আল্লাহর দল) হিসেবে। এইসব মেকি জাঁকজমক, চাকচিক্য থেকে নিজেকে সংযত করো; ইসলামী আদর্শ প্রচারের অগ্রযাত্রায় ও মুসলিম জাতির স্বার্থে কোনো আত্মত্যাগকেই না কোরো না। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে তাঁর পথে অগ্রসর হও এবং অনন্য স্রষ্টা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিও না।

যাইহোক, যদি প্রত্যাশার বিপরীতে মানুষ দেখে যে, আধ্যাত্মিকতার দিকে মনোযোগ দেয়ার বদলে তোমরা কেবল দুনিয়াবি বিষয়েই মশগুল, এবং অন্যদের মত তোমরাও ব্যক্তিগত ও দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের পিছনে ছুটছো, দুনিয়াবি সুখের জন্য লড়াই করছো; এবং আল্লাহ না করুন নিজেদের নোংরা, নীচ দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলাম ও কুরআনকে খেলাচ্ছলে গ্রহণ করছো, ধর্মকে ব্যবসায় পরিণত করেছো – তাহলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেবে, সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বে। তোমরাই এর জন্য দায়ী হবে। যদি মাদ্রাসার পাগড়িধারী লোকেদের কেউ কেউ পদ-পদবী, দুনিয়াবী বিষয়, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ইত্যাদির কারণে পরস্পর মারামারি করে, একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায় ও গিবত করে, তাহলে তারা ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করলো, এবং পবিত্র আস্থার ভঙ্গ করলো। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর আস্থা রেখে তাঁর দেয়া পবিত্র ধর্মকে রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন হলো এক মহান ঐশী আস্থার নিদর্শন। উলামা এবং রুহানিগণ হলেন এই স্বর্গীয় আস্থার বাহক, আর এই আস্থার যেনো ভঙ্গ না হয়, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্বও তাদেরই। (ইসলাম নিয়ে বিবদমান আলেমগণের) এই একগুঁয়েমি, দুনিয়াবী ও ব্যক্তিগত বিরোধ – এগুলো সবই ইসলাম ও তার মহান নবীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা।

আমি জানি না এইসব বিরোধিতা, হীন স্বার্থ হাসিলের জন্য দল তৈরী করা, পারস্পরিক শত্রুতা ইত্যাদির মাধ্যমে কী লক্ষ্য অর্জিত হয়। যদি সেটা তোমাদের দুনিয়াবী স্বার্থে হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের তো দুনিয়াবী তেমন কিছুই নেই! যদি তোমরা দুনিয়াবী আনন্দ-সুখ অর্জন করে থাকো, তাহলে তো এত দ্বন্দ্ব থাকার কথা না ! অবশ্য যদিনা তোমরা সেইসব রুহানি হও, যারা রুহানিয়াত বলতে বোঝে কেবল আলখাল্লা আর পাগড়ি। যেই রুহানি (আলেম, আধ্যাত্মিক ব্যক্তি) আধ্যাত্মিক বিষয়ে মশগুল, যার মধ্যে ইসলামের সংস্কারমূলক গুণাবলী আছে, যে নিজেকে আলী ইবনে আবি তালিবের (আ.) অনুসারী মনে করে, সেতো দুনিয়ার লোভে পড়তে পারে না ! এবং দুনিয়াবী বিষয়কে সে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণও হতে দেবে না। তোমরা যারা নিজেদেরকে বিশ্বাসীদের নেতার (আ.) অনুসারী বলে দাবী করো – এই মহান মানুষটার জীবন সম্পর্কে তোমাদের কিঞ্চিৎ হলেও গবেষণা করে দেখা উচিত, আর ভেবে দেখা উচিত, আসলেই কি তোমরা তাঁর অনুসারী ! তোমরা কি তাঁর তাক্বওয়া, কঠোর সংযম, সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন সম্পর্কে জানো ? তোমরা কি সেটা অনুসরণ করো ? অত্যাচার-অবিচার, শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই মহান মানুষটির লড়াই সম্পর্কে কি তোমরা কিছু জানো ? জানো কিভাবে তিনি নির্যাতিত মানুষকে নির্দ্বিধায় সমর্থন দিতেন, সমাজের বাস্তুহারা দুর্দশাগ্রস্ত শ্রেণীর প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতেন ? তোমরা কি সেটা চর্চা করো ? "শিয়া" শব্দটা কি কেবলই ইসলামের এক আলঙ্কারিক রূপ ? তাহলে, তোমাদের সাথে সেইসব মানুষের পার্থক্য কোথায়, যারা সদগুণের দিক থেকে "শিয়াদের" তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর ? তাদের তুলনায় তোমাদের কী-ই বা বিশেষত্ব আছে ?

যারা আজকে দুনিয়ার একটা অংশকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, হত্যা-রক্তপাত করছে, তারা এসব করছে কারণ তারা দুনিয়ার জাতিগুলোকে লুট করার প্রতিযোগীতায় নেমেছে; তারা প্রতিযোগীতায় নেমেছে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার, মানুষের শ্রমের ফসলকে দখল করা এবং দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলোকে নিজের করায়ত্বে নিয়ে আসার। একারণে তারা স্বাধীনতা, উন্নতি-অগ্রগতি, সীমান্ত রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা ইত্যাদি প্রতারণামূলক শ্লোগান দিয়ে প্রতিদিনই দুনিয়ার কোনো না কোনো প্রান্তে যুদ্ধের আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলছে নিরাপত্তাহীন জাতিগুলোর উপর। দুনিয়াবী বিষয়ে মত্ত কলুষিত মস্তিষ্কের মানুষের কাছে এধরণের যুদ্ধ খুবই যৌক্তিক। কিন্তু তোমাদের (আলেমদের) যে লড়াই, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, তা এমনকি ঐসব দুনিয়ালোভী মানুষের কাছেও অযৌক্তিক। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমরা কেনো পরস্পর লড়াই করছো, তাহলে তারা জবাব দেবে যে ওমুক ওমুক দেশ দখল করার জন্য করছি : ওমুক ওমুক দেশের সম্পত্তি আমাদের নিতে হবে। কিন্তু যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেনো তোমাদের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব, কেনো তোমরা পরস্পর লড়াই করছো, তোমাদের উত্তর কী হবে ? দুনিয়ার কী লাভ তোমরা পাচ্ছো, যার জন্যে তোমরা লড়াই করছো ? মারজা-ই-তাক্বলিদ তোমাদেরকে "শাহরিয়াহ" নামক যে মাসিক ভাতা দেন, তা এমনকি অনেকের সিগারেট-খরচের চেয়েও কম ! ঠিক মনে পড়ছে না, তবে কোনো পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে দেখেছি যে ওয়াশিংটনের একজন ধর্মযাজককে ভ্যাটিকান সিটি থেকে যে পরিমাণ টাকা দেয়া হয়, তা খুবই মোটা অঙ্কের। আমার মনে হয় সেটা শিয়া মাদ্রাসার গোটা বাজেটের চেয়েই বেশি ! তোমাদের এধরণের জীবনযাত্রা ও অবস্থায় কি পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানায় ?

এ সমস্ত দ্বন্দ্ব, আসলে যার কোনো পবিত্র লক্ষ্য নেই, এসব দ্বন্দ্বের গোড়া হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। যদি তোমাদের মাঝে এধরণের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে, তবে এর কারণ হলো তোমরা নিজেদের অন্তর থেকে দুনিয়ার মায়াকে ত্যাগ করতে পারোনি। যেহেতু দুনিয়াবী লাভ খুবই সীমিত, সুতরাং সেটা অর্জনের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তুমি কোনো নির্দিষ্ট পদ অর্জন করতে চাও, যেটা কিনা আরেকজনও চায়, এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এটা ঈর্ষা ও বিবাদের জন্ম দেবে। কিন্তু যারা খোদার লোক, যারা দুনিয়ার মায়াকে অন্তর থেকে বের করে দিয়েছে, এক আল্লাহ ছাড়া যাদের আর কোনো লক্ষ্য নেই, তারা কখনোই একে অপরের সাথে লড়াই করে না; এমন দূর্দশা-অনৈক্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। যদি আজকে স্বর্গীয় নবীগণ সকলে কোনো শহরে একত্রিত হতেন, তবে তাঁদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য কিংবা দ্বন্দ্ব থাকতো না, কারণ তাঁদের সকলের লক্ষ্য ও গন্তব্য একই। তাঁদের প্রত্যেকের হৃদয়ই খোদামুখী, এবং দুনিয়ার যেকোনো মায়া থেকে তাঁরা মুক্ত।
যদি তোমাদের কাজকর্ম, জীবনযাত্রা, অভিযাত্রা তেমনটাই হয় যা এখন দেখা যাচ্ছে, তাহলে তোমরা বরং খোদাকে ভয় করো। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন, তোমরা না আবার আলী ইবনে আবি তালিবের (আ.) অনুসারী না হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করো। তোমাদের ভয় করা উচিত যে, তোমাদের তওবা না-ও কবুল হতে পারে, এবং ইমাম আলীর শাফায়াত তোমার উপকার না-ও করতে পারে। সুযোগ হারানোর আগেই তোমাদের উচিত এই বিষয়টার সমাধান

করা। এইসব তুচ্ছ অপমানজনক দ্বন্দ্ব বাদ দাও। এসব দ্বন্দ্ব-লড়াই সম্পূর্ণরূপে অনুচিত। তোমরা কি (এক মুসলিম জাতি ভেঙে) একাধিক জাতি সৃষ্টি করছো ? তোমাদের ধর্ম কি উগ্র জাতীয়তাবাদের ধর্ম ? কেনো তোমরা সাবধান হচ্ছো না ? কেনো তোমরা বিশুদ্ধ, সৎ ও পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ নও ? কেনো ? কেনো ?

এসব বিভেদ খুব মারাত্মক, কারণ এসবের ফলস্বরূপ এমন অনৈক্যের জন্ম হয়, যার ক্ষতি পূরণ করা অসম্ভব। (বিভেদের ফলস্বরূপ) মাদ্রাসাগুলো শেষ হয়ে যাবে, সমাজে তোমরা হবে মূল্যহীন ও অসম্মানিত। এইসব দল সৃষ্টি করা কেবল তোমাদের-ই ক্ষতি বয়ে আনছে। এটা যে কেবল তোমাদের জন্যই কলঙ্কজনক তা নয়, বরং সমাজ ও জাতির জন্য এটা অসম্মান ও বদনাম ডেকে আনে, ফলস্বরূপ ইসলাম হয় ক্ষতিগ্রস্ত। যদি তোমাদের পরস্পরবিরোধিতার কারণে মুসলিম জাতির মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সেটা হবে অন্যতম কবিরা গুনাহ, কারণ এর ফলে সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি হবে, যা আমাদের উপর শত্রুদের প্রভাব বৃদ্ধির দ্বার খুলে দেবে। সম্ভবত মাদ্রাসার ভিতরে অনৈক্য ও শত্রুতার প্রসার ঘটানোর জন্য কোনো অদৃশ্য হাত কাজ করছে। মানুষের চিন্তাকে দূষিত করে, মানুষের মাঝে সংশয় ঢুকিয়ে দিয়ে এগুলোকে "ধর্মীয় দায়িত্বের" ছদ্মবেশ পরিয়ে সেই অদৃশ্য হাত বিভেদ ও সংঘাতের বীজ বপন করছে। এভাবে তারা ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রে সৃষ্টি করেছে অনৈক্য, যাতে যে ব্যক্তিরা ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারতো, তারা যেনো শেষ হয়ে যায়। তারা যেনো ইসলাম ও ইসলামী সমাজের খেদমতে না আসে। সতর্ক ও সচেতন হওয়াটা আমাদের দরকার। *"আমার ধর্মীয় দায়িত্ব হলো এটুকু, আর ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হলো এটুকু"* — এজাতীয় চিন্তা করে নিজেকে বোকা বানিও না। কখনো কখনো শয়তান মানুষের জন্য দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়। কখনো কখনো স্বার্থপর চাওয়া-পাওয়া মানুষকে বাধ্য করে ধর্মীয় দায়িত্বের নাম করে (স্বার্থলোভী) কাজ করতে। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কিংবা কোনো ভাইয়ের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলা — এগুলো কোনো ধর্মীয় দায়িত্ব নয়। এটাই হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, নিজের প্রতি ভালোবাসা। এগুলোই হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা, যা মানুষের জন্য আঁধার ডেকে আনে। এই শত্রুতা হলো ধ্বংসপ্রাপ্তদের শত্রুতা : *"জাহান্নামবাসীদের জন্যে বাকবিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী।" (সূরা সা'দ, ৩৮:৬৪)*

শত্রুতা আর বাকবিতণ্ডা হলো জাহান্নামের জিনিস। দোযখের মানুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে, থাকে পারস্পরিক মারামারি। যদি তোমরা এই দুনিয়ার জন্যে ঝগড়া করো, তবে সাবধান হও ! কারণ তোমরা নিজেদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করছো, আর তোমরা তার মাঝপথে আছো। পরকালের দুনিয়ায় তো কোনো কিছুর জন্যে মারামারি নেই ! ওপারের দুনিয়ার মানুষেরা বিশুদ্ধ, প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। তাদের পরস্পরের মাঝে কেবলই শান্তি। খোদার প্রতি ভালোবাসা আর আনুগত্য তাদের হৃদয় ছাপিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো আল্লাহতে ঈমান আনা ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসা। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা-ই হলো তাঁর ভালোবাসার ছায়া।

তোমার নিজের হাতকে আগুনের মধ্যে দিও না। দোযখের আগুনের শিখাকে উস্কে দিও না। জাহান্নাম মানুষের নোংরা কাজকর্ম দ্বারা প্রজ্বলিত। এগুলো হলো একগুঁয়ে লোকেদের কাজ, যা দোযখের আগুনকে প্রজ্বলিত করে। হাদীসে বর্ণিত আছে : *"আমি জাহান্নামকে অতিক্রম করেছি যখন তার আগুন নেভানো ছিলো।"* যদি কোনো মানুষ নিজের কর্ম দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বলিত না করে, তবে জাহান্নামের চিহ্ন থাকবে না। এজাতীয় (একগুঁয়ে) আচরণের ভিতরেই থাকে জাহান্নাম। এজাতীয় আচরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানে জাহান্নামের দিকেই এগিয়ে যাওয়া। যখন মানুষ এই দুনিয়া থেকে চলে যায়, তার সামনে পর্দা উন্মোচিত হয়, তখন সে উপলব্ধি করে যে : *"এ হলো তারই ফল, যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজহাতে পাঠিয়েছো,..." (আলে ইমরান, ৩:১৮২)* এবং *"তারা তাদের কৃতকর্মকে সেখানে উপস্থিত দেখবে" (সূরা কাহফ, ১৮:৪৯)।* মানুষের এই দুনিয়ার সকল কৃতকর্ম অপর দুনিয়ায় দেখা যাবে, এবং তার জন্যে সেই কর্মগুলোকে সত্যিকার রূপ দেয়া হবে : *"অতঃপর কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও দেখতে পাবে।" (সূরা যালযালাহ, ৯৯:৭-৮)।* মানুষের এই দুনিয়ার সকল কথা-কর্ম অপর দুনিয়ায় প্রতিফলিত হবে। যেনো আমাদের জীবনের সবকিছু ফিল্মে রেকর্ড করা হচ্ছিলো, আর ঐ দুনিয়ায় সেই ফিল্মটা দেখানো হবে, এবং কেউ-ই সেটার বিন্দুমাত্র অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের সকল কাজকর্ম, পদক্ষেপ — সবকিছু আমাদেরকে দেখানো হবে, সেইসাথে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেবে সাক্ষ্য : *"... তারা (মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ত্বক) বলবে : আল্লাহ, যিনি সকল কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন।..." (সূরা ফুসসিলাত, ৪১:২১)।*

আল্লাহ, যিনি সকল কিছুকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সাক্ষী বানাবেন, তাঁর সামনে তোমার কোনো নোংরা কর্মকেই তুমি অস্বীকার করতে বা লুকাতে পারবে না। একটু চিন্তা করো, সামনে তাকাও, তোমার কর্মের পরিণতি ভেবে দেখো, মৃত্যুর পরে যেসব ভয়ানক ঘটনা ঘটে তা স্মরণে রাখো, কবরের চাপকে স্মরণ করো, বারযাখের দুনিয়াকে স্মরণ করো, এবং তার পরে যে যন্ত্রণা-দূর্দশা আসবে, তাকে উপেক্ষা কোরো না। অন্ততঃ জাহান্নামে বিশ্বাস রাখো। যদি কোনো মানুষ মৃত্যুর পরের ভয়ানক ঘটনাগুলোর কথা স্মরণে রাখে, সে তার জীবন যাপনের ধারা বদলে ফেলবে। যদি এই বিষয়ে তোমাদের ঈমান ও নিশ্চয়তা (নিশ্চিত জ্ঞান) থাকতো, তবে তোমরা এতো স্বাধীনভাবে নীতিহীন জীবন যাপন করতে না।

তোমাদের লেখনী, তোমাদের পদক্ষেপ, তোমাদের জিহবা – এগুলোকে সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রণ করো সংস্কার ও নিজেদেরকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্য।

অধ্যায় – ৮ : ঐশী দয়া

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের দয়া করেন বলে তিনি মানুষকে বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। মানুষ যেনো নিজেকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে পারে, সেই ক্ষমতা দান করেছেন। নবী ও আউলিয়াগণকে (আল্লাহর বন্ধু) পাঠিয়েছেন মানুষকে সঠিকপথে গাইড করার জন্য, যেনো মানুষ আত্মসংস্কারের মাধ্যমে নিজেদেরকে জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। যদি এই পদ্ধতিতে কাজ না হয় (অর্থাৎ মানুষের মাঝে সংস্কার ও সচেতনতা সৃষ্টি না হয়), তবে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অন্য উপায়ে সচেতন করেন : নানারকম সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য, অসুস্থতা ইত্যাদি দ্বারা। ঠিক একজন দক্ষ চিকিৎসক কিংবা ভালো নার্সের মতই তিনি (আল্লাহ তায়ালা) অসুস্থ মানুষকে তার ভয়ানক আত্মার রোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। যদি আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে দয়া করেন, তবে সে একের পর এক দুর্দশায় পতিত হতে থাকবে, যতক্ষণ না সে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নিকট ফিরে আসে, নিজের সংস্কার সাধন করে। এটাই হলো প্রকৃত পথ, এছাড়া আর কোনো পথ নেই; কিন্তু এপথের শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে মানুষকে নিজ পায়েই হাঁটতে হবে। যদি (দুঃখ-দুর্দশা-পরীক্ষার মধ্যদিয়ে আত্ম-সংস্কার ও আত্মশুদ্ধির) এই পথে মানুষ সাফল্য লাভ না করে, পথভ্রষ্ট মানুষটির অন্তরের রোগ দূর না হয়, যদি সে বেহেশত পাওয়ার উপযোগী না হয়, তাহলে তার আত্মাকে টেনে বের করার সময় তার উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হবে, যেনো সে ফিরে আসে, সতর্ক হয়। যদি এতেও কাজ না হয়, তাহলে কবরে, অর্থাৎ আলমে বারযাখে যেসব ভয়ানক ঘটনা ঘটে, সেখানে তাকে যন্ত্রণা ও শাস্তি দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিশুদ্ধ হয়, তার সংস্কার হয়; এবং এরপর সে দোযখে যাবে না। এর সবই হলো মানুষকে দোযখ থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর দয়া। যদি আল্লাহর এত দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও মানুষ বিশুদ্ধ না হয় ? তাহলে তার শুদ্ধির জন্য আগুনে পোড়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। ইতিহাসের কত মানুষ আত্মশুদ্ধির পথে আসেনি, নিজের সংস্কার করেনি, এবং এইসব পন্থায়ও তাদের শুদ্ধি ঘটেনি, এবং শেষমেষ দয়াময় ও করুণাময় খোদা তার বান্দাকে আগুনে পুড়ানোর মাধ্যমে বিশুদ্ধ করেছেন, ঠিক যেভাবে সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করা হয়।

"তারা সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে" (৭৮:২৩), কুরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে বলা হয় যে এখানে উল্লিখিত "শতাব্দীর পর শতাব্দী" হলো তাদের জন্য, যাদেরকে পথ দেখানো হয়েছে, যাদের ঈমানের ভিত্তিকে রক্ষা করা হয়েছে (ইমাম বাক্বিরকে (আ.) এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন : এই আয়াত হলো তাদের জন্য, যাদেরকে একসময় আগুন থেকে বের করা হবে। (মাজমু'-আল-বয়ান, ভলিউম ১০, পেইজ ৪২৪))।

এটা হলো তোমার-আমার মত মানুষের জন্য, যদি আমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকি। প্রতিটা যুগের (আইয়াম) দৈর্ঘ্য হাজার বছর – আসলে যে কত, খোদা-ই ভালো জানেন। আল্লাহ না করুন, আমরা না আবার এমন অবস্থায় পৌঁছে যাই যে আমাদেরকে বিশুদ্ধ করার এই পন্থাগুলোও কাজে আসবে না, আর চিরসুখের জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই সর্বশেষ পন্থার দরকার পড়বে। আল্লাহ না করুন, "যেসব বাগানের তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়" (৫৮:২২), সেই স্থানে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য না আবার মানুষকে কিছুদিনের জন্য দোযখে পুড়তে হয় (যেনো সে পাপ-পঙ্কিলতা, আত্মিক অশুদ্ধি এবং শয়তানের বৈশিষ্ট্য থেকে বিশুদ্ধ হতে পারে) !

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পন্থা হলো তাদের জন্য, যাদের পাপের মাত্রা সর্বশক্তিমান আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হওয়ার মাত্রায় পৌঁছায়নি; যাদের মাঝে বেহেশতে যাবার ন্যূনতম হলেও কিছু জিনিস অবশিষ্ট আছে। আল্লাহ না করুন, কোনো মানুষের পাপ এতই অপরিসীম হয়ে যায় যে, সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ও বহিষ্কৃত হতে হয়, ঐশী দয়া থেকে বঞ্চিত হয়, এবং অনন্তকাল দোযখের আগুনে পোড়া ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো পথ না থাকে। আল্লাহ না করুন, তোমরা না আবার ঐশী দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত হও এবং তাঁর (আল্লাহর) রাগ, অভিশাপ ও শাস্তির মুখোমুখি হও। তোমাদের কথা-কর্ম, আচরণ যেনো তোমাদেরকে খোদার করুণা থেকে এমনভাবে বঞ্চিত না করে যে অনন্ত ধ্বংসের মুখোমুখি হও।

এখন, যেখানে তোমরা এক মিনিটের জন্যও জ্বলন্ত একটা পাথর হাতে রাখতে পারো না, তাহলে দোযখের আগুনকে নিজের থেকে দূরে রাখো ! মাদ্রাসা ও আলেমগণকে এই আগুনের থেকে দূরে রাখো। তোমাদের অন্তর থেকে ঝগড়া-বিবাদকে অনেক দূরে সরিয়ে ফেলো। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো, রহমান-রহিম (করুণাময়, দয়ালু) হবার চেষ্টা করো। অবশ্য পাপী লোকেদের পাপ ও খোদাদ্রোহীতার ব্যাপারে নম্র হওয়া চলবে না। বরং তাদেরকে মুখের উপর বলে দাও যে সে পাপ করছে, তাকে নিষেধ করো, এবং নিজেও নৈরাজ্য ও বিদ্রোহ সৃষ্টি কোরো না। আল্লাহর বান্দা এবং সংকর্মীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের কারণে সম্মান করো, সৎপথের

ব্যক্তিদেরকে তাদের সদগুণের কারণে সম্মান করো, এবং জ্ঞানহীন অশিক্ষিতদেরকেও সম্মান করো, কারণ তারাও আল্লাহরই বান্দা। উত্তম আচরণের অধিকারী হও, দয়ালু হও, হও সৎ এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ। নিজের সংস্কার করো। তুমি গোটা একটা কমিউনিটিকে গাইড করতে চাও, তাদেরকে সংস্কার করতে চাও; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেরই সংস্কার ও সংশোধন করতে সক্ষম নয়, সে কী করে অপরকে পথ দেখাবে ? শাবান মাসের আর অল্প কিছুদিন বাকি। এই ক'দিনে তওবা করে নিজেকে বদলে ফেলো, এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশুদ্ধ আত্মা হিসেবে প্রবেশ করো।

অধ্যায় – ৯ : শাবান মাসের মুনাজাত সম্পর্কে

তোমরা কি মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে শাবান মাসের সেই বিশেষ মুনাজাত নিবেদন করেছো, মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে মুনাজাত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে ? এই মুনাজাতের সুউচ্চ তাৎপর্য, যা আল্লাহর ব্যাপারে উন্নত ঈমান ও জ্ঞানের শিক্ষা দেয়, তা থেকে তোমরা উপকৃত হয়েছো কি ? এই মুনাজাত সম্পর্কে বলা হয় যে এটা ইমাম আলী (আ.) এর মুনাজাত (তাঁর ও তাঁর বংশধরদের উপর এবং সকল নিষ্পাপ ইমামের উপর সালাম), তিনি এই মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিবেদন করতেন। খুব কম দুআ ও মুনাজাত পাওয়া যাবে যা সকল ইমামই (আ.) আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতেন। সত্যিই, এই মুনাজাত হলো পবিত্র রমজান মাসের দায়িত্বগুলি গ্রহণ করার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা ও সতর্ক করার উপায়। এর মাধ্যমে সচেতন ব্যক্তিকে রোজার উদ্দেশ্য এবং এর মূল্যবান প্রতিদানগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া সম্ভব।
নিষ্পাপ ইমামগণ (আ.) মুনাজাতের মাধ্যমে অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মুনাজাতের ভাষা আদেশ-নিষেধের ভাষা থেকে একদমই আলাদা। মুনাজাতের মাধ্যমে তাঁরা গভীর আধ্যাত্মিক, অবস্তুগত এবং ঐশী বিষয় ব্যাখ্যা করতেন, আল্লাহর সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুনাজাত করে যাই, অথচ এর অর্থের দিকে কোনো মনোযোগই দিই না, এবং তাঁরা মুনাজাতের মাধ্যমে আসলে কী বলতে চেয়েছেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা বুঝতে ব্যর্থ হই।

এই মুনাজাতে আমরা বলি : *"হে আমার রব ! আমি যেনো তোমার ধ্যান ছাড়া আর সকল কিছুর থেকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারি, এবং তোমার দিকে তাকানোর মাধ্যমে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে এমনভাবে আলোকিত করতে পারি, যেনো আলোর পর্দা ছিন্ন করে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি তোমার মহত্বের নিকটবর্তী হয়, এবং আমাদের আত্মা পরিপূর্ণভাবে তোমার সুপবিত্র সত্তার মালিকানাধীন হয়ে যায়।"*
"হে আমার রব ! আমি যেনো তোমার ধ্যান ছাড়া আর সকল কিছুর থেকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারি" – এই কথাটার অর্থ এমনটিও হতে পারে যে, ঐশী বিষয়ে সচেতন ব্যক্তিরা পবিত্র রমজান মাসের আগে দুনিয়াবি সুখ ত্যাগ করার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করেন (আর দুনিয়াবি সুখকে ত্যাগ করার মাধ্যমেই আল্লাহ ব্যতীত আর সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়)। আল্লাহ ব্যতীত আর সকল কিছু থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা সহজ কাজ নয়। এজন্যে খুব কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ক্ষেত্রবিশেষে সেইসাথে আধ্যাত্মিক চর্চা, ধৈর্য্য, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেনো মানুষ আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর সকল কিছু থেকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।
যদি কেউ এই কাজে সফল হয়, তাহলে সে অত্যন্ত সম্মানিত স্থান অর্জন করেছে। তবে, দুনিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকলে আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব না। যেভাবে রমজানের রোজা পালন করতে বলা হয়েছে, পবিত্র রমজানে কেউ যদি ঠিক সেইভাবেই রোজা রাখতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। একাজ তাকে করতে হবে যেনো সে আল্লাহর এই (নৈকট্য লাভের) উৎসব ঠিকভাবে পালন করতে পারে, মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব ততখানি পর্যন্ত এই উৎসবের আয়োজকের (Host, Allah) স্থান বুঝতে পারে। আমাদের পবিত্র রাসূল (সা.) এর (তাঁর ও তাঁর বংশধরদের উপর সালাম) একটি বক্তব্য অনুযায়ী, এই পবিত্র রমজান মাসে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়োজিত উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য সকল বান্দাকে আহবান জানিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন : *"হে মানুষ ! আল্লাহর মাস এগিয়ে আসছে... আর তোমাদেরকে আল্লাহর এই উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।"* পবিত্র রমজান মাস আসার আগের এই কয়েকটি দিনে তোমাদের চিন্তা করা উচিত, আত্মিক সংস্কার করা উচিত, এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত, অনুচিত কর্ম ও আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, এবং খোদা না করুন, তুমি যদি কোনো পাপ করেই থাকো, তবে সেক্ষেত্রে পবিত্র রমজান মাসে প্রবেশ করার আগেই ক্ষমাপ্রার্থনা করো। সর্বশক্তিমান খোদার প্রতি আন্তরিক মুনাজাতে তোমার অন্তরকে অভ্যস্ত করে ফেলো।

আল্লাহ না করুন, কিন্তু তোমরা না আবার এই পবিত্র রমজান মাসে পরচর্চা, গিবত ইত্যাদিতে, অর্থাৎ মোটকথা পাপে লিপ্ত হও এবং মহান আল্লাহ তায়ালার দেয়া এই উৎসবে সীমালঙ্ঘন করে নিজেদেরকে দূষিত করে ফেলো। এই সম্মানিত মাসে তোমাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, সুতরাং সর্বশক্তিমানের এই অপূর্ব উৎসবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। অন্তত রোজা রাখার বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতিকে সম্মান করো। (রোজা

রাখার প্রকৃত রীতি-নীতিগুলো অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, আর সেজন্যে সার্বক্ষণিক যত্ন ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।) রোজা রাখার অর্থ কেবলমাত্র খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকা নয়, বরং মানুষকে পাপ থেকেও বিরত থাকতে হবে। এটুকু হলো তাদের জন্য, যারা নিতান্তই আনকোরা। (স্বর্গীয় মানুষেরা, যাঁরা খোদার মহত্বের খনি উন্মোচন করতে চান, তাদের ক্ষেত্রে রোজার নিয়ম-কানুন এর থেকে আলাদা।) অন্ততঃ রোজার প্রাথমিক আদব কায়দা মেনে চলা উচিত, এবং যেভাবে করে পানাহার থেকে বিরত থাকো, ঠিক একইভাবে চোখ, কান এবং জিহবাকেও সীমালঙ্ঘন করা থেকে সংযত করো। এখন থেকে তোমাদের জিহবাকে অপরের সমালোচনা, গিবত, মন্দ কথা এবং মিথ্যা থেকে দূরে রাখো; হিংসা-জিঘাংসা এবং অন্যান্য শয়তানী বৈশিষ্ট্যকে নিজের অন্তর থেকে বহিষ্কার করো। যদি পারো, আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলো। প্রতারণা না করে নিষ্ঠার সাথে কাজ করো। মানুষ এবং জ্বীনদের মধ্যে যেসব শয়তান আছে, তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলো। যদিও আমরা দৃশ্যতঃ এই মহামূল্যবান মর্যাদাকে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে পারি না, অন্ততপক্ষে এটুকু নিশ্চিত করার চেষ্টা করো যেনো তোমার রোজার সাথে কোনো পাপ না থাকে। তা না হলে তোমার রোজা ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হলেও সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

কোনো কাজের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হওয়া না হওয়া এবং সেই কাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া – এই দুয়ের মাঝে বিরাট ব্যবধান আছে। যদি পবিত্র রমজান মাসের শেষে তোমাদের কথা ও কর্মে কোনো পরিবর্তন না আসে, তোমাদের আচার-আচরণ যদি রোজার মাসের আগের দিনগুলোর থেকে ভিন্ন না হয়, তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে রোজার প্রকৃত তাৎপর্য তোমরা উপলব্ধি করতে পারো নাই। আর তোমরা যা করেছো, তা কেবলই দৈহিক রোজা।

এই মহান মাস, যে মাসে তোমাকে ঐশী উৎসবে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এসময়ে যদি তুমি খোদার ব্যাপারে মারেফত (অন্তর্দৃষ্টি) অর্জন করতে না পারো, কিংবা অন্ততঃ নিজের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে না পারো, তাহলে বুঝে নিতে হবে তুমি আল্লাহর দেয়া এই উৎসবে ঠিকভাবে অংশগ্রহণ করো নাই। তোমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এই পবিত্র মাস, যা কিনা "আল্লাহর মাস", যে সময়ে খোদার বান্দাদের জন্যে ঐশী দয়ার দরজা খুলে যায়। এবং কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এ সময়ে শয়তানদেরকে শিকল পরিয়ে রাখা হয়; আর এমন সময়ে যদি তোমরা নিজেদের সংস্কার করতে না পারো, আত্মশুদ্ধি করতে না পারো, নফস-এ-আমারাহ কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারো, নিজের স্বার্থপর কামনা-বাসনাকে দমন করতে না পারো, এই দুনিয়া ও বস্তুজগতের মায়া ত্যাগ করতে না পারো, তাহলে রোজার মাস শেষ হওয়ার পরে এগুলো অর্জন করা তোমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হবে। তাই এই অপূর্ব দয়া শেষ হবার আগেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করো, আত্মসংস্কার করো, নিজেকে বিশুদ্ধ করে তোলো। রোজার মাসের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এমনটা যেনো না হয় যে, রমজান মাস আসার আগেই শয়তান তোমাকে এমনভাবে আক্রান্ত করে ফেলেছে যে, যখন শয়তানকে শিকলবন্দী করে রাখা হয়েছে, তখন তুমি নিজে থেকেই নানারকম পাপকাজ ও ইসলামবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছো ! অনেকসময় খোদা থেকে দূরে সরে যাবার কারণে এবং বড় বড় গুনাহের কারণে সীমালঙ্ঘনকারী পাপী মানুষ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের এতই অতলে নেমে যায় যে, শয়তানের আর তাকে প্ররোচিত করার প্রয়োজন হয় না, বরং সে নিজেই শয়তানের রং ধারণ করে। "সিবগাত আল্লাহ" হলো শয়তানের রঙের বিপরীত।

যে ব্যক্তি স্বার্থপর কামনা-বাসনার পিছনে ছোটে যে শয়তানের প্রতি অনুগত, ধীরে ধীরে সে-ও শয়তানের রঙ ধারণ করে। অন্ততপক্ষে এই একটা মাসে তোমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, এবং মহামহিম খোদা অসন্তুষ্ট হন, এমন কথা ও আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত। এখনই, এই আজকের দিনেই খোদার সাথে চুক্তি করো যে পবিত্র রমজান মাসে তোমরা পরচর্চা, গিবত, অপরের সম্পর্কে মন্দ বলা, ইত্যাদি কাজ পরিত্যাগ করবে। তোমার জিহবা, চোখ, হাত, কান এবং অন্যান্য অঙ্গকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসো। নিজের কথা ও কর্মকে তদারকি করো। তাহলে হয়তো আল্লাহ তোমার দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং দয়া করবেন। একমাস রোজার পর শয়তানকে যখন শিকলমুক্ত করা হবে, ততদিনে তোমার সংস্কার হয়েছে, তুমি বদলে গেছো, তুমি আর শয়তানের ধোঁকায় প্রতারিত হবে না, তুমি নিজেই নিজেকে বিশুদ্ধ করে তুলবে। আমি আবারো বলছি, পবিত্র রমজানের এই তিরিশটি দিনে তোমার জিহবা, চোখ, কান এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণের প্রতিজ্ঞা করো। সেইসাথে তুমি যেসব কাজ করার চিন্তা করছো, বা যেসব বিষয় শোনার পরিকল্পনা করছো, সেসবের ব্যাপারে শরয়ী দৃষ্টিকোণ কী, সেদিকে সতর্ক নজর রাখো। এটা হলো রোজা রাখার প্রাথমিক এবং বাহ্যিক নিয়ম। অন্ততঃ রোজার এই বাহ্যিক রীতিনীতিটুকু পালন করো ! কাউকে গিবত করতে

দেখলে তাকে থামাও, বলো যে রোজার এই ত্রিশ দিনে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা (আল্লাহর সাথে) বিশেষ চুক্তি করেছি। আর যদি তাকে পরচর্চা থেকে বিরত করতে না পারো, তাহলে সেই স্থান ত্যাগ করো। বসে বসে গিবত শুনো না। মুসলমানেরা যেনো তোমার থেকে নিরাপদ থাকে।
যার চোখ, হাত জিহবা থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ নয়, সে প্রকৃত মুসলিম নয়; যদিও সে মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করা আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক মুসলমান। আল্লাহ না করুন, কিন্তু যদি তোমরা কাউকে আঘাত করতে চাও, গিবত করতে কিংবা অপবাদ আরোপ করতে চাও, তাহলে জেনে রাখা উচিত যে তোমরা তোমাদের প্রভুর সামনেই আছো। (এই মাসে) তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার অতিথি, (আর এসময়ে যদি কারো উপর অপবাদ আরোপ করো কিংবা গিবত করো, তবে সেক্ষেত্রে) মহামহিম খোদার সামনে তোমরা তাঁরই কোনো বান্দার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, আর খোদার কোনো বান্দাকে অপবাদ দেয়া মানে হলো খোদাকেই অপবাদ দেয়া। তারা খোদারই বান্দা, বিশেষতঃ যদি তারা জ্ঞান ও তাক্বওয়ার পথে পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে থাকেন। লক্ষ্য করে দেখবে যে, ক্ষেত্রবিশেষে এজাতীয় মন্দ কাজ মানুষকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে মৃত্যুর মুহুর্তেও সে খোদাকে অস্বীকার করে! সে ঐশী নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে : *"অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।" (সূরা আর-রূম, ৩০:১০)* এগুলো ধীরে ধীরে ঘটে। আজকে একটা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, আগামীকাল একটু-আধটু গিবত, পরশু কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে অপবাদ, এমনি করে অন্তরে এসব পাপ একটু একটু করে জমা হয়; অন্তরকে কালো করে দেয়, মারেফত (খোদার সম্পর্কে জ্ঞান) অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এবং এভাবে বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে মানুষ সবকিছু অস্বীকার করে অবশেষে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে।

কুরআনের কয়েকটি আয়াতের কিছু তাফসির অনুযায়ী, মানুষের কর্মকে রিভিউ করার জন্য রাসূল (সা.) ও নিষ্পাপ ইমামগণের (আ.) সামনে উপস্থাপন করা হবে। যখন রাসূল (সা.) তোমার কর্মকে রিভিউ করবেন এবং দেখবেন যে সেটা কতই না ভুল ও পাপে পূর্ণ, কতটা দুঃখিত তিনি হবেন ! তুমি নিশ্চয়ই খোদার মনোনীত বান্দাকে দুঃখিত ও চিন্তিত দেখতে চাও না, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর মন ভেঙে দিতে চাও না, তাঁকে দুঃখ দিতে চাও না। যখন তিনি দেখবেন যে তোমার হিসাবের খাতা কেবলই গিবত, অপবাদ, অপর মুসলিমের সম্পর্কে নাহক কথায় পূর্ণ, আর দেখবেন যে তোমার সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্র ছিলো যত দুনিয়াবী আর বস্তুবাদী বিষয়, আর তোমার হৃদয় ছিলো হিংসা, জিঘাংসা, সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ – সেক্ষেত্রে পরম পবিত্র আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে তিনি (রাসূল (সা.)) বিব্রত হতে পারেন যে তার সম্প্রদায় ও অনুসারীরা ঐশী দয়ার ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ ছিলো, এবং বেখেয়াল হয়ে তারা দুর্বীনিতভাবে মহান স্রষ্টার আস্থা ভঙ্গ করেছে। আমাদের নিজেদের লোক, এমনকি যদি কম সম্মানিত ব্যক্তিও হয়, তবুও সে ভুল করলে আমরা বিব্রত বোধ করি। আর তোমরা তো আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তির (মুহাম্মাদের) ক্বওম (জাতি), (তাঁর ও তাঁর বংশধরদের উপর সালাম) – আর মাদ্রাসায় দাখিল হওয়ার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের সাথে আরো বেশি সম্পর্কযুক্ত করে ফেলেছো। এই তোমরা যদি নোংরা কাজ করো, তবে নবী (সা.) ব্যথিত হবেন, তিনি এটা সহ্য করতে পারবেন না, আর আল্লাহ না করুন (একারণে) তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও। আল্লাহর রাসূল (তাঁর ও তাঁর বংশধরদের উপর সালাম) ও বিশুদ্ধ ইমামগণকে আল্লাহর সামনে দুঃখিত ও ব্যথিত কোরো না।
মানুষের অন্তর হলো আয়নার মতন — উজ্জ্বল, পরিষ্কার — কিন্তু বেশি বেশি দুনিয়ার মায়া আর পাপের কারণে সে আয়না অন্ধকার হয়ে যায়। রোজার মাধ্যমে মানুষ কামনা-বাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ভোগ-বিলাসকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কেউ যদি অন্ততঃ প্রতারণা না করে নিষ্ঠা সহকারে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা রাখে, (আমি বলছি না যে অন্যান্য ইবাদতগুলো নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে না; অবশ্যই সবরকম ইবাদতই নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে হবে), তাহলে আশা করা যায় যে, অন্ততঃ এই একটা মাসে যথাযথভাবে রোজা রাখার পুরস্কার হিসেবে খোদার করুণা তাঁর বান্দার উপর বর্ষিত হবে, এবং বান্দার হৃদয়ের আয়না থেকে কলুষ ও অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, এবং দুনিয়াবী আনন্দ থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর যখন ক্বদরের রাত উপস্থিত হবে, তখন এই বান্দা আলোকিত হয়ে উঠবে, যেটা আল্লাহর ওলী আর প্রকৃত মুমিনেরা অর্জন করেন।

এ ধরণের রোজার পুরস্কার হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা : *"সাওম আমার জন্য এবং আমিই এর পুরস্কার।"* আর কোনো কিছুই এমন রোজার পুরস্কার হতে পারে না। এমনকি স্বর্গীয় বাগানও এমন রোজার পুরস্কার হতে পারে না।

কেউ যদি রোজাকে মনে করে একদিকে খাদ্যের জন্য মুখ বন্ধ রাখা আর অপরদিকে গিবতের জন্য মুখ খুলে দেয়া; বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উষ্ণ আড্ডায় সেহরি পর্যন্ত রাতভর পরচর্চায় লিপ্ত থাকা, তবে এমন রোজা কোনোই কাজে আসবে না, এর কোনো প্রভাবও থাকবে না। যে এভাবে রোজা রাখে, সেতো খোদার উৎসবে যোগ দেবার ন্যূনতম ভদ্রতাটুকু জানে না। সে তার দয়াময়ের হক নষ্ট করেছে – দয়াময় আল্লাহ, যিনি কিনা মানুষ সৃষ্টির আগেই তার জীবন যাপন ও বৃদ্ধির সকল উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি পথপ্রদর্শনের জন্য নবী পাঠিয়েছেন। তিনি ঐশী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। মানুষকে দান করা হয়েছে মহত্বের উৎস ও আলো (আল্লাহ তায়ালা) পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি, দেয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর রহমত পাবার সম্মান। এখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর গেস্টহাউজে প্রবেশের আমন্ত্রণ দান করেছেন, যেনো মানুষ সেখানে রহমতের টেবিলে বসে খোদার শোকর গুজার করতে পারে এবং তাঁর যথাসম্ভব গুণকীর্তন করতে পারে। যে বান্দা খোদার পক্ষ থেকে এমন সুযোগ পায়, যে কিনা খোদার-ই দেয়া অফুরন্ত রিজিক গ্রহণ করছে – সেই প্রভু, সেই মেজবানের বিরোধিতা করা কি এমন বান্দার সাজে ? খোদার দেয়া রিজিক ব্যবহার করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা করবে – এটা কি বান্দার করা উচিত ? যে হাত মুখে তুলে খাইয়ে দেয়, সে হাতে কামড় দেয়ার মতই কি না এ ব্যাপারটা ? খোদার উপস্থিতিতে তাঁরই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে রূঢ় আচরণ, অশ্রদ্ধা, উদ্ধত কাজকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে মেজবানের (আল্লাহ) অসম্মান-ই কি করা হবে না ? মেজবানের সামনে নোংরা এবং খারাপ কাজ করলে সেটা মানুষের অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত হবে।

(রমজানের এই) অতিথিদের অবশ্যই জানতে হবে কে তার মেজবান, এবং তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। রোজার রীতিনীতির সাথে পরিচিত হতে হবে। সৎগুণাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক কাজকর্মের মাধ্যমে খোদাদ্রোহীতা করা যাবে না। পরম সত্তার অতিথিদের জানতে হবে মহিমান্বিত প্রভুর সান্নিধ্য কী জিনিস – যা পাওয়ার জন্য নবীগণ (আ.) ও ইমামগণ (আ.) সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতেন; আলো ও মহত্বের উৎসকে পেতে চাইতেন। *"...এবং আমাদের অন্তরের দৃষ্টিকে তোমার দিকে তাকানোর মাধ্যমে আলোকিত করে দাও, যতক্ষণ না আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোর পর্দাকে ছিন্ন করে মহত্ত্বের উৎসের সাথে মিলিত না হয়।"* আল্লাহর দেয়া এই সভা-ই হলো সেই "মহত্ত্বের উৎস"। সদা প্রশংসিত মহিমান্বিত খোদা তাঁর বান্দাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আলো ও মহত্ত্বের উৎসে প্রবেশ করার জন্য। কিন্তু বান্দা যদি অযোগ্য হয়, তবে সে এই চমৎকার মহান অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে না। সদাপ্রশংসিত খোদা তাঁর বান্দাদেরকে সবধরণের দয়া ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির উৎসবে আহবান জানিয়েছেন, কিন্তু যদি বান্দা এই সুউচ্চ অবস্থানে উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুত না থাকে, সে প্রবেশ-ই করতে পারবে না। এটা কী করে সম্ভব যে দেহ ও মনের পাপ, আধ্যাত্মিক অবিশুদ্ধতা ও নীচতা সহকারে কেউ তার প্রভুর গেস্টহাউজে প্রবেশ করবে তাঁর সান্নিধ্য পাবার জন্য ? সেজন্যে যোগ্যতা প্রয়োজন। প্রস্তুতি নেয়া দরকার। অন্ধকারের পর্দা দ্বারা আবৃত অসম্মানিত দূষিত হৃদয় নিয়ে কোনো ব্যক্তি এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও সত্যগুলো উপলব্ধি করতে পারবে না। সেজন্যে অবশ্যই সেসব পর্দা, যা আল্লাহর সাথে অন্তরের মিলিত হবার পথে বাধা, সেগুলিকে ছিন্ন করতে হবে। তবেই না একজন চমৎকার খোদায়ী সান্নিধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

অধ্যায় – ১০ : মানুষের অন্তরের পর্দা

খোদা ছাড়া অন্য যেকোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ মানুষকে অন্ধকার ও আলোর পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলে। যদি কোনো দুনিয়াবী বিষয় মানুষের মনোযোগকে দুনিয়ার দিকে নিয়ে যায় এবং মহিমান্বিত খোদাকে উপেক্ষা করার কারণ হয়, তবে (অন্তরের উপর) অন্ধকার পর্দা পড়ে যায়। বস্তুজাগতিক দুনিয়ার সবই হলো অন্ধকার পর্দা। অপরপক্ষে, এই দুনিয়া যদি মহাসত্যের দিকে মনোযোগী হবার উপকরণ হয়, উপকরণ হয় পরকালীন বাসস্থান, যা হলো "সম্মানজনক আবাস" – সেখানে উপস্থিত হবার, তাহলে এই অন্ধকার পর্দাগুলো আলোর পর্দায় রূপান্তরিত হয়। "আর সবকিছু থেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া" অর্থ হলো সকল অন্ধকার ও আলোর পর্দাকে ছিন্ন করে দূরে ঠেলে দেয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐশী গেস্টহাউজে প্রবেশ করা যাচ্ছে – ঐশী গেস্টহাউজ, যা হলো "মহত্ত্বের উৎস"। তাই (শা'বান মাসের) এই মুনাজাতে মহান খোদার নিকট অন্তরের দৃষ্টি এবং ঔজ্জ্বল্যের জন্য নিবেদন করা হয়, যেনো মুনাজাতকারী আলোর পর্দাগুলিকেও ছিন্ন করে মহত্ত্বের উৎসের নিকট পৌঁছে যায়। *"যতক্ষণ না অন্তরের দৃষ্টি আলোর পর্দাকে এমনভাবে ছিন্ন করে যে, সে মহত্ত্বের উৎসের সাথে মিলিত হয়।"*

কিন্তু যে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত অন্ধকারের পর্দাগুলিই ছিন্ন করতে পারেনি, যে ব্যক্তি তার সকল মনোযোগ প্রাকৃতিক দুনিয়ার দিকে নিবদ্ধ করেছে, এবং আল্লাহ না করুন আল্লাহর থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, এবং যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার উর্ধ্ব অপর জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতসমূহ সম্পর্কে মূলতঃ বেখবর, এবং নিজেকে এমন এক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে যে, সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়নি, তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি, তার অন্তরকে আবৃত করে ফেলা অন্ধকারের পর্দাগুলিকে দূরে ঠেলার সিদ্ধান্ত নেয়নি – সে নিজেকে (জাহান্নামের) "অতল গহবরের" বাসিন্দা করে ফেলেছে, যা হলো চূড়ান্ত পর্দা : *"অতঃপর তাকে নামিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।" (সূরা আত-ত্বীন, ৯৫:৫)*, অথচ যেখানে রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টির সর্বোচ্চ সম্মানিত অবস্থায় ও সম্মানজনক অবস্থান দিয়ে তৈরী করেছেন : *"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আত-ত্বীন, ৯৫:৪)।*
কেউ যদি নিজের কামনার দাস হয়ে পড়ে, এবং যখন থেকে সে নিজেকে বুঝতে শুরু করে, তখন যদি নীচ দুনিয়াবি বিষয় ছাড়া অন্য কোনোদিকে মনোযোগ না দেয়, এবং মনে না করে যে এই নোংরা অন্ধকার দুনিয়ার উর্ধ্বে অন্য কোনো জায়গা ও অবস্থান রয়েছে, তাহলে সে অন্ধকারের পর্দায় ডুবে যাবে, এবং তাদের মত হয়ে যাবে, যাদের কথা বলা হয়েছে কুরআনে : *"কিন্তু সে অধঃপতিত ও নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইলো।" (সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৭৬)।*

পাপ দ্বারা দূষিত এমন এক হৃদয়, অন্ধকারের পর্দা যাকে আবৃত করে ফেলেছে, এবং নানান পাপকর্মের দরুণ সেই অন্ধকার হৃদয় মহান খোদার থেকে এতই দূরে সরে গিয়েছে যে, প্রবৃত্তির উপাসনা আর দুনিয়ার পিছনে ছোটা তার বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছে – এমন হৃদয়ের ব্যক্তি অন্ধকার পর্দার আবরণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না; আলোর পর্দা ছিন্ন করে আল্লাহ ব্যতীত আর সকল কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা তো দূরের কথা। এমন ব্যক্তির ঈমান সর্বোচ্চ এতটুকু হতে পারে যে সে অন্ততঃ ওলি-আউলিয়াগণের অবস্থানকে অস্বীকার করবে না, এবং আলমে বারযাখ, সিরাত, পুনরুত্থান, বিচার, কিতাব, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে কল্পকাহিনী মনে করবে না। দুনিয়ার প্রতি অন্তরের আসক্তি এবং নানান পাপের দরুণ মানুষ ধীরে ধীরে এই সত্যগুলিকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করে আল্লাহর ওলি-আউলিয়াগণের অবস্থানকে, (শা'বানের এই) মুনাজাতে যার কথা বেশ কয়েক লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যায় – ১১ : জ্ঞান ও ঈমান

এমন লোককেও তোমরা দেখবে যে, (আধ্যাত্মিকতার) এই বাস্তবতাগুলি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আছে, কিন্তু এর উপর ঈমান নেই। যারা গোরস্থানে কাজ করে, তারা মৃত মানুষকে ভয় পায় না, কারণ তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে মৃত মানুষ কারো ক্ষতি করতে পারে না; এমনকি মানুষটি যখন বেঁচে ছিলো, সেই দেহে আত্মা ছিলো, তখনও সে ক্ষতির কারণ ছিলো না, আর প্রাণবিহীন এই শূন্য খাঁচা কী-ই বা ক্ষতি করতে পারবে ? কিন্তু যারা মৃত মানুষকে ভয় পায়, তারা একারণে ভয় পায় যে, এই বিষয়ের সত্যতায় তাদের আস্থা নেই। তাদের কেবলমাত্র জ্ঞান আছে। তারা স্রষ্টা সম্পর্কে জানে, জানে প্রতিদান দিবস সম্পর্কে, কিন্তু তারা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত নয়। তাদের বুদ্ধিশক্তি যা বুঝতে পেরেছে, সে ব্যাপারে তাদের অন্তর বেখবর। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ তারা জানে, জানে পুনরুত্থান দিবসের বাস্তবতা সম্পর্কেও, কিন্তু ঠিক এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রমাণগুলিই হয়তো হৃদয়ের সামনে এমন এক পর্দা হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, যা অন্তরে ঈমানের আলোকে জ্বলে উঠতে দিচ্ছে না। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হবে না, যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অন্ধকার ও বাধাবিঘ্ন হতে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আসেন : *"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক; তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।... "(সূরা বাকারা, ২:২৫৭)।* আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যার অভিভাবক, তিনি যাকে অন্ধকার থেকে বের করে আনেন, সে আর একটি পাপও করে না, অপরের গিবত করে না, মানুষকে অপবাদ দেয় না, এবং সে কখনোই দ্বীনি ভাইদের প্রতি হিংসা-দ্বেষ পোষণ করে না। তার নিজের হৃদয়ই আলোকিত এক অনুভুতি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, এবং সে তখন আর দুনিয়া বা দুনিয়াবী বিষয়কে বেশি আদরণীয় করে দেখে না। যেমনটা ইমাম আলী (আ.) বলেছেন: *"যদি আমাকে গোটা দুনিয়া আর এতে যা কিছু আছে তার সবকিছু দেয়া হতো, আর তার বিনিময়ে একটা পিঁপড়ার মুখ থেকে অন্যায়ভাবে, নিষ্ঠুরভাবে বার্লি দানার খোসা কেড়ে নিতে বলা হতো, আমি কখনোই সে প্রস্তাব গ্রহণ করতাম না।"*

কিন্তু তোমাদের কেউ কেউ সব বিষয়ে নিজেদেরকে জড়াতে চাও; আর ইসলামের মহান স্কলারদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলো। সাধারণ মানুষেরা যদি রাস্তার আতর বিক্রেতা কিংবা মুদি দোকানি সম্পর্কে গিবত করে তো তোমরা গিবত করো ইসলামের স্কলারদের, তাদেরকে অপমান করো, তাদের সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বলো – কারণ তোমাদের ঈমান দৃঢ় নয় এবং কর্মফল যে ভোগ করতে হবে, সে ব্যাপারে তোমরা বিশ্বাস করো না।

আর কিছু নয়, বরং ইসমত (নিষ্পাপতা, নির্ভুলতা) হলো পরিপূর্ণ ঈমান। নবী ও আউলিয়াগণের বিশুদ্ধতার মানে এই নয় যে, জিব্রাইল (আ.) হাতে ধরে তাঁদেরকে পথ দেখিয়েছেন। অবশ্যই, যদি জিব্রাইল (আ.) শিমারকে পথ দেখাতেন, তবে সে কখনোই পাপ করতো না। কিন্তু নিষ্পাপতা হলো আসলে ঈমান থেকে উৎসরিত। কোনো মানুষের যদি মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান থাকে, এবং সে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে খোদাকে সেভাবেই দেখে, যেভাবে সে চোখ দিয়ে দেখে সূর্যকে, তাহলে তার দ্বারা কোনো পাপ সংঘটন সম্ভব হবে না। সশস্ত্র ব্যক্তির সামনে মানুষ যেমন "নিষ্পাপ" হয়ে যায়, অনেকটা তেমন। এই ভয়টা আসে খোদায়ী উপস্থিতির উপর বিশ্বাস থেকে, আর এই বিশ্বাস মানুষকে পাপ করা থেকে বিরত রাখে। মাসুমিন (আ.) (নিষ্পাপগণ) – তাঁদেরকে বিশুদ্ধ মাটি থেকে তৈরী করার পর তাঁদের আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা, দীপ্তি ও সৎ গুনাবলী অর্জনের কারণে তাঁরা নিজেদেরকে খোদার সম্মুখে সদা-উপস্থিত হিসেবে দেখতেন, সর্বজ্ঞ আল্লাহর উপস্থিতিতে – যিনি সকল কিছু জানেন এবং সব বিষয়কে পরিবেষ্টন করে আছেন। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কথাটির তাৎপর্যের উপর তাঁদের ইমান আছে (পরিপূর্ণ আস্থা আছে), এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই নশ্বর, আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই ক্ষমতা নেই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার : *"...আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর সকল কিছু ধ্বংস হবে... "(সূরা আল কাসাস, ২৮:৮৮)।*

সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুনিয়া-ই আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য – এই কথায় যদি মানুষের নিশ্চয়তা ও আস্থা থাকে, এবং মহান আল্লাহ তায়ালা সদা উপস্থিত ও সকল কিছু দেখেন – এতে যদি ঈমান থাকে, তবে সেই ব্যক্তির পাপ করার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। বুঝসম্পন্ন বাচ্চার সামনে মানুষ অপকর্ম করে না, এবং নিজের গোপন অংশ প্রকাশ করে না, তাহলে খোদার উপস্থিতিতে সেই একই কাজ কি সে করে, এবং অপকর্ম করতে ভয় করে না ? এর কারণ হলো, বাচ্চার উপস্থিতির ব্যাপারে তার আস্থা আছে, কিন্তু ঐশী উপস্থিতির (আল্লাহর উপস্থিতি) ব্যাপারে যদিওবা তার জ্ঞান আছে, কিন্তু আস্থা নেই (ঈমান নেই)। নানামুখী পাপ তার হৃদয়কে অন্ধকার ও কালো করে দিয়েছে, যার ফলে

এই সত্যগুলিকে মেনে নিতেই সে অক্ষম হয়ে পড়েছে, এবং এমনকি এগুলোকে অবাস্তবও মনে করছে হয়তো। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ কখনোই বেপরোয়া জীবন যাপন করতো না, যদি সে নিশ্চিত না হোক, একে অন্ততঃ একটা সম্ভাবনা হিসেবে মনে করতো যে, পবিত্র কুরআনে যা বলা হয়েছে তা সত্য, যে ওয়াদাগুলো করা হয়েছে, যে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে – এগুলো সত্য, এবং তার উচিত তার পথ ও কর্মকে সংশোধন করা। যদি তোমরা এমন কথা শুনতে যে এই রাস্তা দিয়ে গেলে হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হতে হবে কিংবা এই রাস্তায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আছে যারা তোমাকে অপহরণ করবে, তাহলে ঠিকই ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়া বাদ দিতে, এবং তথ্যটার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের চেষ্টা করতে। *"জাহান্নাম বলে একটা কিছু হয়তো আছে যেখানে (পাপকর্মের শাস্তি হিসেবে) অনন্তকাল আগুনের মধ্যে থাকতে হবে"* – কেউ এটা মনে করবে, অথচ একইসাথে পাপকাজও করে যেতে থাকবে – এটা কী করে সম্ভব ?

যে ব্যক্তি মনে করে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সদা বিরাজমান ও সবকিছু দেখছেন, এবং সে নিজেকেও তার রবের সামনে উপস্থিত বলে অনুভব করে, যে মনে করে যে তার কথা ও কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, বিচার হবে, শাস্তি হবে, এবং এই দুনিয়ায় নেয়া তার প্রতিটা পদক্ষেপ, উচ্চারিত প্রতিটি কথা, কৃত কর্মগুলো – সবকিছুই রাক্বিব ও আতিদ নামক আল্লাহর ফেরেশতা দ্বারা রেকর্ড করা হচ্ছে, এবং তারা খুব ভালোভাবেই সেটা রেকর্ড করছে – এমতাবস্থায় কি সেই ব্যক্তি নিজের ভুল ও পাপকর্মের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে ? মানুষ এমনকি এই সত্যগুলোকে "সম্ভব" বলেও মনে করা না – এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার। কারো কারো আচার আচরণ ও জীবন যাপন দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে অপার্থিব জগতের অস্তিত্বকেই তারা সম্ভব বলে মনে করে না; কারণ পরকালের জগতটাকে কেবলমাত্র "সম্ভব" বলে মনে করাটাই মানুষকে অসংখ্য ভুল ও পাপ থেকে দূরে রাখে।

অধ্যায় – ১২ : আত্মশুদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ

আর কতকাল তোমরা গাফিলতির মাঝে ঘুমিয়ে থাকতে চাও ? এইভাবে পাপে নিমজ্জিত হয়ে ? খোদাকে ভয় করো ! তোমার কর্মফলের ব্যাপারে সতর্ক হও ! গাফিলতির এই ঘুম থেকে জেগে ওঠো ! না, তোমরা এখনও জেগে ওঠোনি। তোমরা এখনও প্রথম পদক্ষেপটিই নাওনি। (খোদামুখী) অভিযাত্রার পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো ইয়াক্বযাহ (জেগে ওঠা), কিন্তু তোমরা এখনও ঘুমিয়ে আছো। তোমাদের চোখ হয়তো খোলা আছে, কিন্তু হৃদয় ঘুমিয়ে আছে। তোমাদের অন্তর যদি ঘুমিয়ে না থাকতো এবং পাপকর্মের দরুণ কালো না হতো, মরিচা না ধরতো, তাহলে এমন উদাসীনভাবে বেখেয়াল হয়ে নিজেদের অনুচিত কথা-কর্ম চালিয়ে যেতে না। পরকালীন দুনিয়া নিয়ে যদি একটু ভাবতে, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে চিন্তা করতে, তবে তোমরা নিজেদের দায়িত্বগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে।

(এই দুনিয়ার বাইরেও) আরেকটা দুনিয়া আছে, পুনরুত্থান আছে। (মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির মত নয়, যাদের কোনো প্রত্যাবর্তন নেই।) কেনো তোমরা সাবধান হচ্ছো না ? কেনো জেগে উঠছো না, সচেতন হচ্ছো না ? কেনো নিতান্তই অসতর্কভাবে নিজের মুসলিম ভাইয়ের গিবতে লিপ্ত হচ্ছো, তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলছো, অথবা এগুলো শুনছো ? তোমরা কি জানো না যে, যে জিহবা গিবতে লিপ্ত হয়, কেয়ামতের দিন তাকে পদদলিত করা হবে ? গিবত যে জাহান্নামীদের খাবার, তা শুনেছো ? কখনো কি চিন্তা করে দেখোনি এই বিভেদ, শত্রুতা, ঈর্ষা, সন্দেহপ্রবণতা, স্বার্থপরতা আর অহংকার-ঔদ্ধত্যের ফলাফল কতটা মন্দ ? এসব মন্দ নিষিদ্ধ কাজের সূদুরপ্রসারী ফলাফল হলো জাহান্নাম, আর আল্লাহ না করুন, এসব কাজ এমনকি চিরস্থায়ী আগুনের দিকে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে, তা জানো কি ?

আল্লাহ চান না মানুষ এমন রোগে আক্রান্ত হোক, যাতে কষ্ট অনুভুত হয় না। কারণ রোগে কষ্ট অনুভুত হলে মানুষ বাধ্য হয় প্রতিকার খুঁজতে, ডাক্তারের কাছে বা হসপিটালে যেতে, কিন্তু যে রোগে কোনো কষ্ট অনুভুত হয় না, তা আরো ভয়ানক। যতক্ষণে সেটা ধরা পড়ে, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মানসিক অসুস্থতার কারণে যদি ব্যথা অনুভুত হতো, তাহলে সেই ব্যথার জন্য খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো যেতো। কারণ মানুষ বাধ্য হয়ে শেষমেষ প্রতিকার খুঁজতো। কিন্তু ব্যথাহীন এই ভয়ানক রোগের সমাধান কী ? অহংকার ও স্বার্থপরতার রোগের কোনো কষ্ট নেই। (এগুলো ছাড়াও) অন্যান্য পাপ মানুষের হৃদয় ও আত্মাকে দূষিত করে ফেলে, কোনোরূপ ব্যথা অনুভুত হওয়া ছাড়াই। এসব রোগে যে শুধু ব্যথা অনুভুত হয় না, তা নয়, বরং এতে আপাতঃ আনন্দও পাওয়া যায়। পরচর্চার আড্ডাগুলো খুবই আনন্দের ! নিজের প্রতি ভালোবাসা আর দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, যা হলো সকল পাপের মূল, তা-ও সুখকর। ড্রপসি রোগে আক্রান্ত রোগী পানির কারনেই মারা যায়, তবুও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পানি খাওয়াকে উপভোগ করে।

এটাই স্বাভাবিক যে, অসুস্থতার কারণে যদি মানুষ আনন্দ পায়, আর তাতে কোনো ব্যথা-বেদনাও না থাকে, তবে সে এর কোনো প্রতিকার খুঁজবে না। যতই তাকে সতর্ক করা হোক না কেনো যে এটা প্রাণঘাতী রোগ, সে বিশ্বাসই করবে না ! যদি কাউকে ভোগবাদিতা ও দুনিয়াপূজার রোগে পেয়ে বসে, আর দুনিয়ার প্রতি মায়ায় তার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়া আর দুনিয়াবী জিনিস ছাড়া অন্য যেকোনো কিছুতেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ না করুন, তখন সে হবে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহর বান্দাদের শত্রু, নবী-আউলিয়াগণ ও আল্লাহর ফেরেশতাদের শত্রু। তাদেরকে সে অপছন্দ করবে, ঘৃণা করবে। আর যখন খোদার তরফ থেকে ফেরেশতা তার জান কবজ করতে আসবে, তখন তার ঘৃণাবোধ হবে, বিকর্ষণ হবে, কারণ সে দেখবে যে খোদার ফেরেশতা তাকে তার প্রিয়বস্তু (দুনিয়া ও দুনিয়াবী জিনিস) থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

সেক্ষেত্রে এমনও সম্ভব যে সেই ব্যক্তি আল্লাহদ্রোহী হয়ে, খোদায়ী উপস্থিতির প্রতি শত্রুতা পোষণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। কাযভিন এর অন্যতম মহৎ ব্যক্তি (তাঁর উপর সালাম) বলেছিলেন যে, তিনি একবার এক লোকের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহুর্তে সে চোখ খুলে বলেছিলো, "খোদা আমার উপর যে জুলুম করেছেন, আর কারো উপর এত জুলুম করা হয়নি ! খোদা এখন আমায় এই সন্তানদের থেকে আলাদা করতে চান, যাদেরকে বড় করতে আমি এত কষ্ট সহ্য করেছি। এর চেয়ে বড় জুলুম কি আর আছে ?" কেউ যদি নিজেকে পরিশুদ্ধ না করে, দুনিয়া থেকে নজর ফিরিয়ে না নেয়, এবং অন্তর থেকে দুনিয়ার মায়াকে বিতাড়িত না করে, তাহলে আশঙ্কা

থেকে যায় যে, খোদার প্রতি এবং তাঁর আউলিয়াগণের প্রতি উপচে-পড়া রাগ ও ঘৃণা নিয়ে সে দুনিয়া ত্যাগ করবে। তাকে ভয়ানক পরিণাম বরণ করতে হবে। এধরণের লাগামহীন বেপরোয়া মানুষকে কি আশরাফুল মাখলুকাত বলা উচিত, নাকি বলা উচিত আসফালাস সাফিলিন (নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম) ? *"সময়ের শপথ। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।"* কুরআনের এই সূরা অনুযায়ী, (সবাই-ই ক্ষতিগ্রস্ত) কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হলো সেইসব বিশ্বাসীগণ, যারা সৎকাজ করে। আর সৎকাজ অবশ্যই আত্মার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তোমরা দেখবে যে, মানুষের অধিকাংশ কাজই (আত্মার সাথে নয়, বরং) দেহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে না। যদি তুমি দুনিয়া ও নিজের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা পরিচালিত হও, আর এই মায়া যদি তোমাকে আধ্যাত্মিক সত্য ও বাস্তবতাগুলো অনুধাবন করতে বাধা দেয়, বাধা দেয় নির্ভেজালভাবে আল্লাহর রাহে কাজ করতে, সৎকাজের আদেশ ও সবরের তাকিদ করতে, আর ফলশ্রুতিতে সঠিক পথনির্দেশ গ্রহণ করা বাধাগ্রস্ত হয়, তবে তুমি পথভ্রষ্ট ("দোয়াল্লিন" - lost) হয়ে যাবে। পথভ্রষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবে এই দুনিয়ায়, এবং পরকালেও; কারণ যৌবন তুমি শেষ করে ফেলবে, বঞ্চিত হবে স্বর্গীয় সুখ ও পরকালীন অন্যান্য সৌভাগ্য থেকে, এমনকি দুনিয়াবী সৌভাগ্য থেকেও। অন্যান্য মানুষের যদি জান্নাতে যাবার কোনো পথ না-ও থাকে, ঐশী দয়ার দরজা যদি তাদের জন্য বন্ধও হয়ে যায়, যদি জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল বসবাস তাদের জন্য নির্ধারিতও হয়ে যায়, তবুও তারা তো অন্তত এই দুনিয়ার জীবনটাকে সর্বোচ্চ ভোগ করে নেবে, দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ উপভোগ করবে, কিন্তু তুমি ?...

সাবধান ! দুনিয়া ও আত্মপ্রেম না আবার তোমাদের মাঝে এতটা বৃদ্ধি পায় যে, শয়তান তোমাদের ঈমান কেড়ে নিতে সক্ষম হবে ! বলা হয় যে, শয়তানের সকল প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের ঈমান কেড়ে নেয়া। শয়তানের দিবারাত্র সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা হলো মানুষকে ঈমানহারা করার জন্য। ঈমানের গ্যারান্টির দলিল তো তোমাকে কেউ দেয়নি। হয়তো কারো ঈমানটাই ধার করা (অর্থাৎ দৃঢ় নয়), এবং শেষমেষ শয়তান সেটাকে পেয়ে বসবে, আর সে এই দুনিয়া ত্যাগ করবে অন্তরে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর আউলিয়াগণের প্রতি শত্রুতা নিয়ে। আবার হয়তো কেউ জীবনভর ঐশী দয়া পেয়েও শেষজীবনে এসে হতাশ হয়ে ঈমান ত্যাগ করলো, আর দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো রহমান রহিম আল্লাহর বিরোধী হয়ে।
যদি দুনিয়াবী বিষয়ে তোমার কোনো আগ্রহ থাকে, সম্পর্ক থাকে, দুনিয়ার প্রতি মায়া থাকে – তবে তা ছিন্ন করতে চেষ্টা করো। বাহ্যিক জাঁকজমকের এই দুনিয়া এতই তুচ্ছ যে সে ভালোবাসা পাবার যোগ্য নয়। আর যারা দুনিয়ার জীবনের এই তুচ্ছ বাহ্যিক জাঁকজমক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, দুনিয়ার জীবন তো তাদের ভালোবাসা পাবার যোগ্য-ই নয়। এই দুনিয়ার জীবনে তোমাদের কী আছে যে এর প্রতি তোমরা আসক্ত হবে ? মসজিদ, মাদ্রাসা, নামাজের জায়গা কিংবা ঘরের কোণটি ছাড়া তোমাদের আর কিছুই নেই। আর এর জন্য প্রতিযোগীতা করা কি তোমাদের সাজে ?

এগুলো কি তোমাদের ভিতরে মতানৈক্য সৃষ্টি আর সমাজকে দূষিত করার কারণ হতে পারে ? ধরো, দুনিয়াবী মানুষদের মতন তোমাদের জীবনও আরামদায়ক বিলাসী জীবন, আর আল্লাহ না করুন, সেই জীবনটাকে তোমরা ভোগ-বিলাস, পানাহারে কাটিয়ে দিয়েছো। এরপর এই জীবনটা যখন শেষ হবে, তখন দেখবে যে জীবনটা এক সুখ-স্বপ্নের মতন পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই জীবনের প্রতিফল ও দায়বদ্ধতাগুলো ঠিকঠিক সাথেই থাকবে। অনন্ত শাস্তির তুলনায় এই সংক্ষিপ্ত আপাতঃ সুখকর জীবনের (ধরে নিলাম এই জীবন সুখকর) কী মূল্য আছে ? দুনিয়াবী মানুষের শাস্তি কখনো কখনো অনন্তকালের জন্য। দুনিয়াবী মানুষেরা, যারা ভাবে যে তারা দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে লাভবান হয়েছে, তারা ব্যর্থ হয়েছে, এবং তারা ভুলের মধ্যে আছে। সবাই দুনিয়াকে নিজের পরিবেশ-পরিস্থিতির জানালা দিয়ে দেখে, আর মনে করে যে সে যেটুকু দেখেছে, সেটাই হলো দুনিয়া। বস্তুজাগতিক দুনিয়ার যেটুকু মানুষ বিচরণ করেছে ও আবিষ্কার করেছে, বস্তুজাগতিক দুনিয়া তার চেয়ে অনেক বেশি বড়। গোটা এই জগতটার সম্পর্কে বর্ননা আছে যে, "আল্লাহ কখনো এর দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকান নাই।" (বিহারুল আনওয়ার, অধ্যায় ১২২, হাদিস ১০৯) তবে সেই অপর জগতটি কেমন, যার দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন ? যে মহত্বের উৎসের দিকে (আল্লাহর পরম সান্নিধ্যের দিকে) মানুষকে আহবান জানানো হয়েছে, তা আসলে কী রকম ? মহত্ত্বের উৎসকে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করার যোগ্যতা-ই মানুষের নেই।

তুমি যদি নিজের নিয়তকে বিশুদ্ধ করো, কর্মকে সংশোধন করো, অন্তর থেকে পদ-পদবীর প্রতি আকর্ষণ,

নিজেের প্রতি মায়া ইত্যাদি দূর করো, তবে তোমার জন্য একটা উচ্চ মর্যাদার স্থান তৈরী হবে। আল্লাহর সৎ বান্দাদের জন্য যে উচ্চ মর্যাদার স্থান প্রস্তুত করা হয়, তার তুলনায় গোটা দুনিয়া ও এর বাহ্যিক সকল বিষয়ের এমনকি এক পয়সা মূল্য নেই। এই সুউচ্চ অবস্থান অর্জনের চেষ্টা করো। যদি পারো তো নিজেদের কাজে লাগাও, এমনভাবে আত্মোন্নয়ন করো যেনো তোমরা এমনকি এই সুউচ্চ অবস্থানের দিকেও নজর না দাও। এই সুউচ্চ অবস্থান অর্জনের জন্য আল্লাহর ইবাদত কোরো না। বরং খোদাকে ডাকো, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে তাঁকে সেজদা করো কারণ তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য, সর্বশক্তিমান। তবেই আলোর পর্দা ছিন্ন করে মহত্ত্বের উৎসকে লাভ করতে পারবে। কিন্তু এমন অবস্থান কি তোমার বর্তমান কথা-কর্ম দ্বারা অর্জন করা সম্ভব ? তুমি যে পথে হাঁটছো, সে পথে কি সেই অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব ? খোদায়ী শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া, জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা থেকে পালানো কি এতই সহজ ? নিষ্পাপ ইমামগণের (আ.) আল্লাহর কাছে অশ্রুপাত ও ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এর কান্না যে আসলে আমাদের জন্য শিক্ষা, এবং এর মাধ্যমে তাঁরা অন্যদের শিখাতে চেয়েছেন কিভাবে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হয়, তা কি বোঝো ? এত উচ্চ আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহর কাছে সুউচ্চ অবস্থান অর্জন করার পরও তারা খোদার ভয়ে অশ্রুপাত করতেন ! তাঁরা বুঝতেন যে সামনে এগিয়ে চলার পথ কতটা কঠিন ও ভয়ানক। সিরাত, যার একপাশে হলো এই দুনিয়া আর অন্যপাশে পরকালীন দুনিয়া, আর যা জাহান্নামের মধ্য দিয়ে গেছে – সেই সিরাত অতিক্রম করার পরিশ্রম, কষ্ট ও দুঃসাধ্যতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন। তাঁরা আলমে বারযাখ (কবরের জগৎ) সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, সচেতন ছিলেন পুনরুত্থানের ব্যাপারে, শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে। তাই তাঁরা কখনোই তৃপ্ত ছিলেন না, সদা সর্বদা ঐশী শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

এসব ভয়াবহ শাস্তি নিয়ে তোমরা কী চিন্তা করেছো ? আর তা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নিয়ে ? কখন তোমরা আত্মসংস্কার ও আত্মশুদ্ধির সিদ্ধান্ত নেবে ? এখন, যতদিন তোমাদের বয়স কম, যৌবনের শক্তি আছে নিজেদের ভিতর, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার শক্তি আছে, শারীরিক দুর্বলতা পেয়ে বসেনি এখনো, এমন সময় যদি পরিশুদ্ধির চিন্তা না করো, নিজেদের গড়ে না তোলো, তাহলে যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তোমাদের দেহমন দুর্বলতার কবলে পড়বে, ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, পাপের বোঝা তোমাদের হৃদয়কে কালো করে ফেলবে – তখন কিভাবে পরিশুদ্ধ হবে, নিজেকে গড়ে তুলবে ? জীবনের ফেলে আসা প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা পদক্ষেপ, প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে আত্মসংস্কার আরো কঠিন হয়ে আসে, আর অন্তরের ব্যাধি ও অন্ধকার বৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়তে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তি কমে আসে, নেতিবাচক গুনাবলী বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে আত্মশুদ্ধি, সদগুণাবলী ও তাক্বওয়া অর্জন কঠিন হয়ে যায়। মানুষ তখন আর তওবা করতে পারে না। তওবা তো আর কেবল মুখে বলা নয় যে "আমি আল্লাহর কাছে তওবা করলাম", বরং অনুতপ্ত হওয়া ও পাপকর্ম ত্যাগ করাই হলো তওবা। যে ব্যক্তি পঞ্চাশ কিংবা সত্তর বছর যাবৎ মিথ্যা, গিবত ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিলো, পাপ আর সীমালঙ্ঘন করতে করতেই যার দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে, তার পক্ষে এভাবে অনুতপ্ত হয়ে পাপকর্ম ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। এমন মানুষেরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাপেই নিমজ্জিত থাকে।

তরুণ যুবকদের নিষ্কর্মা বসে থেকে বয়সের ভারে সাদা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। (আমি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছি, বৃদ্ধ বয়সের দূর্ভাগ্য ও কষ্ট সম্পর্কে আমি জানি।) তরুণ বয়সেই তোমরা কিছু অর্জন করতে পারবে। যতদিন যৌবনের শক্তি ও দৃঢ়তা আছে, তোমরা নিজেদের স্বার্থপর কামনা-বাসনাগুলোকে বিতাড়িত করতে পারবে, দূর করতে পারবে দুনিয়াবী আকর্ষণ ও পাশবিক বৃত্তিগুলোকে। কিন্তু যদি তরুণ বয়সেই আত্মসংস্কারের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলার চিন্তা না করো, তাহলে যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবে, ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যাবে। বয়স থাকতে থাকতেই চিন্তা করো, শ্রান্ত-ক্লান্ত বৃদ্ধ হবার আগেই চিন্তা করো। তরুণ অন্তর হলো জান্নাতী হৃদয়, এই অন্তরে রোগের প্রতি ঝোঁক কম থাকে। কিন্তু বয়স্ক মানুষের অন্তরে রোগের প্রতি ঝোঁক থাকে প্রবল, তার হৃদয়ে পাপের শেকড় এতটাই গভীর ও দৃঢ় যে তা উৎপাটন করা যায় না। যেমনটা ইমাম বাক্বির (আ.) বলেছেন যে, মানুষের অন্তর একটা আয়নার মতন। প্রতিটা পাপকর্মের সাথে সাথে এতে একটি করে কালো দাগ পড়তে থাকে, এবং এভাবে দাগ পড়তে পড়তে শেষমেষ এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, খোদার নাফরমানী ছাড়া একটা দিনও পার হয় না।

মানুষ যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তখন অন্তরকে প্রকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কঠিন। আল্লাহ না করুন, যদি আত্মশুদ্ধি না করেই দুনিয়া ত্যাগ করো, তাহলে কিভাবে খোদার সামনে দাঁড়াবে, যেখানে তোমার অন্তরটা কালো হয়ে গিয়েছে, চোখ-কান-জিহবা পাপে কলুষিত হয়ে গিয়েছে ? যে জিনিস পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় তোমাকে দেয়া

হয়েছিলো, আস্থা ভঙ্গ করে তাকে কলুষিত করে কিভাবে সেটা আল্লাহর কাছে ফেরত দেবে ? এই চোখ, কান, যা তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন, এই হাত, এই জিহবা, যা তোমার আদেশ মেনে চলছে, শরীরের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — এগুলো সবই তোমার কাছে সর্বশক্তিমান খোদার আমানত, আর এগুলো তোমাকে দেয়া হয়েছিলো শতভাগ পবিত্র, বিশুদ্ধ অবস্থায়। এগুলো দিয়ে পাপকর্ম করলে তা অবিশুদ্ধ, কলূষিত হয়ে যায়। আল্লাহ না করুন, এগুলো যদি নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়, তাহলে যখন আমানত ফেরত দেবার সময় আসবে, তখন হয়তো জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আমানতের জিনিস কি এভাবেই রক্ষা করতে হয় (যেভাবে তুমি একে রেখেছিলে) ? যখন তোমার কাছে আমানত রাখা হয়েছিলো, তখন কি এগুলো এই অবস্থায়ই ছিলো ? তোমাকে যে অন্তর দেয়া হয়েছিলো, সেটার কি এই দশা ছিলো ? তোমাকে যে দৃষ্টি দান করা হয়েছিলো, তা কি এমনই ছিলো ? তোমার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যাকে তোমার ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছিলো, সেগুলো কি এরকম নোংরা আর কলুষিত ছিলো ? আমানতের এত বড় খেয়ানত করে কিভাবে খোদার সামনে দাঁড়াবে ?

তোমরা এখনও তরুণ। তোমরা এমনভাবে জীবন যাপন করেছো যে, দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক আরাম-আয়েশই ত্যাগ করেছো। এখন যদি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়, যৌবনের সুসময়গুলো খোদার পথে ব্যয় করো নির্দিষ্ট পবিত্র এক লক্ষ্য নিয়ে, তাহলেই এই জীবনটা আর ব্যর্থ হবে না; বরং ইহকাল ও পরকাল তোমারই হবে। কিন্তু তোমাদের আচার-আচরণ যদি এমনই থেকে যায় যেমনটা দেখা যাচ্ছে, তাহলে তোমরা যৌবনকে নষ্ট করেছো এবং জীবনের সবচে সুন্দর সময়টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পরকালে খোদার সামনে তোমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, তিরস্কার করা হবে, এবং খোদাদ্রোহী কাজকর্মের শাস্তি কেবল ঐ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং এই দুনিয়াতেও নানাবিধ কষ্ট-ক্লেশ, দুর্গতি, সমস্যা ইত্যাদি তোমাদের আঁকড়ে ধরবে, আর দুর্ভাগ্যের ঘূর্ণিস্রোতে পড়ে যাবে।

অধ্যায় – ১৩ : আরেকটি সতর্কবাণী

তোমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার : সকল স্তরে অসংখ্য শত্রু তোমাদের ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে; তোমাদেরকে আর মাদ্রাসাকে ধ্বংস করার জন্য ভয়ানক সব শয়তানি পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে আছে। উপনিবেশবাদীরা তোমাদেরকে কী করবে, তা নিয়ে তারা স্বপ্ন দেখে; ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের গভীর সব স্বপ্ন আছে। ইসলামের রূপ ধরে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ছক এঁকেছে। শুধুমাত্র পরিশুদ্ধি, সঠিক প্ল্যান-পরিকল্পনা ও ডিসিপ্লিনের মাধ্যমেই তোমরা এই অবক্ষয় ও প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে, আর উপনিবেশবাদীদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে পারবে। আমি এখন জীবনের শেষ দিনগুলি পার করছি। আজ হোক কাল হোক আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু তোমাদের সামনে আমি কালো অন্ধকার দিন দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমরা আত্মসংস্কার না করো, প্রস্তুত না হও, এবং যদি তোমাদের অধ্যয়ন ও জীবনযাত্রাকে নিয়মমাফিক পরিচালনা না করো, তাহলে, আল্লাহ না করুন, তোমরা শেষ হয়ে যাবে। সুযোগ হারানোর আগেই, প্রতিটা ধর্মীয় ও তত্ত্বীয় বিষয়ে শত্রুর কবলে পড়ার আগেই চিন্তা করো ! ঘুম ভাঙো ! জেগে ওঠো !
প্রথম কাজ হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের ও আত্মসংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া। প্রস্তুত হও, নিজেদের গুছিয়ে নাও। মাদ্রাসায় কিছু নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করো। মাদ্রাসার বিষয় আর কাউকে নাক গলাতে দিও না। আর কাউকে মাদ্রাসার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দিও না, যখন তারা বলে, "এরা এগুলো চালাতে পারবে না, এসব তাদের কাজ নয়, এরা হলো মাদ্রাসায় জড়ো হওয়া একদল অকর্মন্য।" আর এরপর তারা মাদ্রাসা সংস্কারের নামে তোমাদেরকে ও মাদ্রাসাকে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নষ্ট করবে। তোমাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে কোনো সুযোগ দিও না। যদি তোমরা নিজেরাই সুসংগঠিত ও পরিশুদ্ধ হও, এবং যদি প্রতিটা বিষয়েই তোমরা রুটিনবদ্ধ ও গুছানো হও, তাহলে কেউ তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করার স্বপ্ন দেখতে পারবে না। তখন মাদ্রাসা ও আলেম সমাজে অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ থাকবে না। প্রস্তুত হও, নিজেদের বিশুদ্ধ করো। যে দূর্দশার মোকাবিলা তোমাদের করতে হবে, তাকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হও। অনাগত ঘটনাবলী মোকাবিলার জন্য মাদ্রাসাকে প্রস্তুত করো।

আল্লাহ না করুন, কিন্তু তোমাদের সামনে অন্ধকার দিন। বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি খারাপ সময়ের জন্য খুবই সুবিধাজনক। উপনিবেশবাদীরা ইসলামের সকল দিক ধ্বংস করতে চায়, তোমাদের অবশ্যই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। নিজের প্রতি ভালোবাসা ও পদ-পদবীর প্রতি ভালোবাসা, গর্ব ও অহংকার – এগুলো অন্তরে থাকলে তোমরা কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারবে না। একজন অসৎ স্কলার, যে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, যে নিজের পদ-পদবী রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত, এমন স্কলার কখনো ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। বরং সে অন্যান্যদের তুলনায় ইসলামের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর হবে। খোদার তরে একটি পদক্ষেপ নাও। অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রতি মায়া দূর করে দাও। তবেই তোমরা জিহাদ করতে পারবে। এখন থেকে এই বিষয়টাই তোমার অন্তরে গড়ে তোলো, জাগিয়ে তোলো যে, আমি অবশ্যই ইসলামের একজন সশস্ত্র যোদ্ধা হবো, ইসলামের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবো। নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ইসলামের জন্য কাজ করে যাবো। "এখন এর উপযুক্ত সময় না", একথা বলে অজুহাত তৈরী কোরো না। ইসলামের কাজে লাগার চেষ্টা করো। সংক্ষেপে, মানুষ হয়ে ওঠো ! উপনিবেশবাদীরা প্রকৃত মানুষকে ভয় পায়। তারা মানুষের ভয়ে ভীত। ধর্মশিক্ষাকেন্দ্র ও জ্ঞানচর্চাকেন্দ্রগুলো মানুষ গড়ার কারখানা হবে, তা উপনিবেশবাদীদের চায় না। তারা মানুষকে ভয় পায়। কোনো দেশে যদি একজন হলেও প্রকৃত মানুষ পাওয়া যায়, সেটা তাদেরকে অসুবিধায় ফেলে, তাদের স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলে।

নিজেদেরকে গড়ে তোলা তোমাদের দায়িত্ব, দায়িত্ব হলো নিখুঁত, নির্ভেজাল পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা, ইসলামের শত্রুদের নোংরা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যদি তোমরা সুসংগঠিত ও প্রস্তুত না হও, ইসলামের উপর যে চাবুকের আঘাত প্রতিনিয়ত আসছে, যদি তার বিরুদ্ধে লড়াই না করো, তবে যে কেবল তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে তা-ই না, বরং ইসলামের রীতি-নীতি আইন-কানুনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; আর এর জন্য তোমরাই দায়ী থাকবে। তোমরা আলেমরা ! এই স্কলাররা ! তোমরা মুসলিমেরা ! তোমরা দায়ী থাকবে। "তোমরা সবাই রাখাল, আর পালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমাদেরই।" তোমাদের যুবকদের অবশ্যই নিজের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করতে হবে যেনো প্রতিটা শোষণ-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারো। এছাড়া ভিন্ন কোনো পন্থা নেই : তোমাদের মর্যাদা, ইসলামের মর্যাদা, ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা তোমাদের প্রতিরোধের উপর নির্ভরশীল।

হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ! ইসলামকে, মুসলমানকে ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে বিদেশী শয়তান থেকে রক্ষা করো। ইসলামী রাষ্ট্রে ও মাদ্রাসাগুলোতে সক্রিয় উপনিবেশবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের হাত কেটে দাও। ইসলামের উলামা ও মহান মারজাগণকে (অনুসরণযোগ্য আলেম) পবিত্র কুরআনের আইনের পক্ষে লড়াইয়ে সাহায্য ও বিজয় দান করো, ইসলামের পবিত্র আদর্শ প্রচারে তাদেরকে সহায়তা করো। ইসলামের বর্তমান যুগের আলেমগণকে তাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলো। মাদ্রাসাগুলোকে এবং ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোকে ইসলামের শত্রুদের প্রভাবমুক্ত করো এবং উপনিবেশবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করো, নিরাপদে রাখো। তরুণ আলেমগণকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে এবং গোটা মুসলিম জাতিকে আত্মগঠন ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের তৌফিক ও সাফল্য দান করো। ইসলামের জনগণকে মুক্তি দাও অজ্ঞতার ঘুম থেকে, দুর্বলতা থেকে, ঔদাসীন্য ও চিন্তার অনমনীয়তা থেকে, যেনো কুরআনের দ্যুতিময় বৈপ্লবিক শিক্ষা গ্রহণ করে তারা ফিরে আসতে পারে, জেগে ওঠে, এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ছায়াতলে এসে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ থেকে উপনিবেশবাদী ও ইসলামের চিরশত্রুদের শেকড় কেটে দিতে পারে, যেনো মুসলিম জাতি ফিরে পায় হারানো স্বাধীনতা, মুক্তি, আভিজাত্য ও মহত্ত্ব। *"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দান করো ধৈর্য্য, এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো, আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে।" (সূরা বাক্বারা, ২:২৫০)*

The Munajat of Sha'ban
The Intimate Devotion of the month of Sha'ban

In The Name Of Allah, The Merciful, The Compassionate

My Lord, bestow Your blessings on Muhammad and on the folk of Muhammad.

Hear my Prayer when I Pray to You,
and hear my call when I call to You.
Turn to me when I whisper to You my devotions.
For I have fled to You
and am standing before You
imploring You in humility
in hope of that which You have as my reward.
You Know what is in my soul
and You are aware of my need.
You are acquainted with my mind,
and nothing of my returning and my destination is hidden from You:
not that with which I intend to begin speaking,
nor the request I would utter,
and of the hopes I have for the hereafter.
O my Lord! Whatever You have destined for me until the end of my life
concerning the secret and open aspects of my life,
it is in Your hand and in the hand of none else,
my abundance and my deficiency,
my benefit and my harm.
My God! If You deprive me
who will provide for me?
And if You forsake me
who will help me?
My God! I seek refuge in You from Your wrath
and from the arrival of Your displeasure.
My God! If I am unworthy of Your Mercy,
You are certainly worthy of generosity to me by the virtue of Your Graciousness.
My God! It is as though I myself were standing before You
and were in the shade of my trust in You,
then You said that of which You are worthy
and You covered me with Your forgiveness.
My God! If You forgive me, then who is more suited for that than You?
And if the moment of my death has come near
but my deeds have yet not brought me near to You,
then I make this confession of my sins to You my vehicle.
My God! I have recklessly failed to look after my soul,
so it is doomed if You do not forgive it.
My God! Your favor has been constant throughout the days of my life,
so do not cut off Your favor from me at the time of my death!
My God! How can I despair of Your watching well over me after my death,
when You have wrought nothing but beauty in my life?
My God! Do that of which You are worthy in my case

and bestow Your grace upon a sinner engulfed in his ignorance.
My God! You have concealed my sins in this world,
while I am in greater need of their concealment in the hereafter.
As You have not exposed my sins to any of Your righteous servants,
do not disgrace me on the Day of Resurrection before everyone.
My God! Your generosity has inflated my hopes
and Your forgiveness is better than my deeds.
My God! Delight me with Your encounter on the day You judge among Your servants.
My God! My apology to You is the apology of one who cannot afford
that his apology not be accepted.
So accept my apology, O most Generous of those to whom the evil
doers offer their apologies!
My God! Do not reject my need,
do not disappoint me in what I covet,
and do not cut off my hopes and aspirations from You.
My God! If You had wanted to degrade me,
You would not have guided me;
if You had wanted to disgrace me,
You would not have kept me safe and sound.
My God! I do not think You will refuse me in this need
in whose solicitation from You I have spent my life.
My God! To You is due all praise,
always and forever, eternally,
increasing, not diminishing,
as You like and please.
My God! If You hold me for my crimes,
I will hold on to You for Your forgiveness,
and if You hold me for my sins,
I will hold on to You for Your pardon.
If You cast me into the Fire,
I will announce to its inmates that I love You.
My God! If my works are too little regarding obedience to You,
there is indeed much regarding my hopes in You and my aspirations.
My God! How can I turn away from nigh unto You bereft, in failure,
when I had such a good opinion of Your generosity that You would
turn me away from being bereft of salvation.
My God! I have wasted my life on the evil of inattentiveness toward You
and I have worn out my youth in the drunkenness of estranging my- self from You.
My God! I did not awaken when I was under a delusion about You
and was inclined toward the way of Your wrath.
My God! I am Your servant, the son of
Your servant, standing before You
trying to use Your own magnanimity as a means to You.
My God! I am a servant who would
excuse himself before You of that which I did in front
of You because I lacked shame of being
watched by You; and I seek Your forgiveness,
for forgiveness is a characteristic of Your generosity.
My God! I was not strong enough to remove myself from disobedience to You
until You awakened me to Your love.

I was as You wanted me to be
So I thank You for bringing me to
Your generosity and for purifying my heart
of the filth of negligence of You.
My God! Look upon me as one
whom You called and who answered You,
whom You helped by employing him
and who obeyed You.
O Near One who is not far from one who is estranged!
O Generous One who does not withhold
His reward from one who hopes for it!
My God! Provide me with a heart, the passion of which may bring it near to You;
with a tongue, the truth of which may be offered up to You;
and with a vision whose character may bring it nigh to You.
My God! whoever becomes acquainted with You is not an unknown;
whoever takes shelter with You is not abandoned;
one to whom You turn cannot be owned.
My God! Whoever takes the path to You is enlightened,
and whoever resorts to You is saved.
And I have cleaved to You, O my God!
So do not disappoint me of Your Mercy,
and do not block me from Your kindness.
My God! place me among You friends
in the position of one who hopes for an increase in Your love.
My God! Inspire me with a fervor for the remembrance of You until I
have become inspired with remembrance of You
and spiritual zeal for the success of Your Name and the station of Your Sanctity.
My God! By You I invoke You
to join me to the place of those who are obedient to You
and the abode of the righteous of those with whom You are pleased.
I can neither defend myself
nor control that which is in my interests.
My God! I am Your weak and sinful
servant and Your repentant slave,
so do not make me one of those from whom You avert Your face
and whose inattentiveness blocks him from Your forgiveness.
My God! Make me completely cut off from all else but You
and enlighten the vision of our hearts
with the radiance of looking at You
until the vision of our hearts penetrates the veils of light
and reaches the Source of Grandeur
and set our spirits to be suspended by the glory of Your sanctity.
My God! Make me of those who answer You when You call them,
who are thunderstruck by Your Majesty when You Look at them,
and who work for You openly when You whisper to them secretly.
My God! I have not allowed my good
opinion of You to be overcome by despair,
nor have I lost hope in the favor of Your generosity.
My God! If my mistakes have
degraded me with You, ignore them

in virtue of my reliance on You.
My God! If my sins have lowered me
to unworthiness of Your kindness,
my certainty has roused me to the nobility of Your affection.
My God! If I have been put to sleep
by neglecting to prepare to encounter You,
I have been roused by knowledge of the nobility of Your blessings.
My God! If Your great punishment invites me to the Fire,
Your abundant reward invites me to heaven.
My God! I ask and beseech You,
I implore and entreat You
to bestow Your blessings on Muhammad and on the folk of Muhammad,
and to make me of those who are constant in their remembrance of You,
and who never violate their covenant with You,
who never neglect giving thanks to You
and who do not depreciate Your commands.
My God! Join me to the Light of Your resplendent Might,
so I may have gnosis of You
and may be diverted from all else but You,
and be fearfully watchful of You.
O sublime and Noble!

May the blessings of Allah be with Muhammad, His Apostle, and with his immaculate folk, abundant salutations prayed for their peace!